আমরা কি এক অঘোষিত যুদ্ধে সামিল হতে চলেছি?
—পৃঃ ১৬

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

গো-বলয় ও বাঙালি
—পৃঃ ৩১

৬৮ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা।। ২৮ ডিসেম্বর ২০১৫।। ১১ পৌষ - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

আমরা কি এক অঘোষিত যুদ্ধে সামিল হতে চলেছি ?

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ১৫ সংখ্যা, ১১ পৌষ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

২৮ ডিসেম্বর - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : শঙ্কুর ত্রিশঙ্কু দশা ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

মমতার চোখে কে চোর আর কে সৎ বোঝা দুষ্কর ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

পণ্য পরিষেবা কর : আশা ও আশঙ্কা : ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১১

সপ্তম শতাব্দীর ধর্মীয় বর্বরতা ও কট্টরপন্থা একবিংশ শতাব্দীর মানুষ বরদাস্ত করবেন না ▯ মে: জে: কে. কে. গঙ্গোপাধ্যায় ▯ ১৩

আমরা কি এক অঘোষিত যুদ্ধে সামিল হতে চলেছি? ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৬

মা দন্তেশ্বরী ▯ গোপালকৃষ্ণ রায় ▯ ২১

প্রণাম জানাই সেই অবিস্মরণীয়াকে ▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ২৩

অবশেষে ভারতের অর্থনীতি মুখ তুলে চাইতে শুরু করেছে ▯ রাজীব কুমার ▯ ২৭

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা ▯ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার ▯ ২৯

গো-বলয় ও বাঙালি ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮▯ খেলা : ৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

অশোক সিংহল স্মরণ সংখ্যা

সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন হিন্দু পুনর্জাগরণের পুরোধা ও রামজন্মভূমি আন্দোলনের অগ্রণী পুরুষ অশোক সিংহল। তাঁর প্রতি স্বস্তিকা-র শ্রদ্ধাঞ্জলি— অশোক সিংহল স্মরণ সংখ্যা। রঙিন এই সংখ্যাটিতে প্রয়াত সিংহলের ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন ডা: প্রবীণ তোগাড়িয়া, দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, বালকৃষ্ণ নাইক, বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক, মহুয়া ধর প্রমুখ। সেই সঙ্গে থাকবে সিংহলজীর জীবনের বেশ কিছু ঘটনার ছবি। সংখ্যাটি সংরক্ষণযোগ্য। সত্বর কপি বুক করুন।

প্রকাশিত হচ্ছে ৪ জানুয়ারি, ২০১৬।। দাম একই থাকছে ১০ টাকা

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

কংগ্রেসের অতি চালাকি

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া-রাহুল গান্ধী-সহ কংগ্রেসী নেতাদের জামিন পাইবার আশা ছিল এবং সেই আশা পূরণ হওয়ায় দলের নেতা-কর্মীরা বিপুল উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন। এই উল্লাসের মাধ্যমে কংগ্রেস দেশবাসীকে জানাইতে চাহিতেছে, এই মামলার পিছনে বিজেপি, কেন্দ্রীয় সরকার, বিশেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত রহিয়াছে। দিল্লীর উচ্চ ন্যায়ালয় যেদিন এই আদেশ দিয়াছিলেন এবং সোনিয়া-রাহুল ও অন্য কেহই আদালতের সেই আদেশ এড়াইয়া যাইতে পারিবেন না জানিয়াও সেইদিন হইতেই কংগ্রেস এই অপপ্রচারের রাজনীতি শুরু করে। বিস্ময়ের বিষয় হইল, যে সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর দায়ের করা মামলায় তাঁহাদের আদালতে যাইতে হইল, সেই স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া তাঁহারা প্রধানমন্ত্রীর দিকে আঙুল তুলিয়াছেন। যদিও কংগ্রেস ভালোভাবেই জানে যে এই মামলা যখন সুব্রহ্মণ্যম স্বামী আদালতে দায়ের করেন তখন কেন্দ্র সরকারে বিজেপি ছিল না এবং প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন তাহাদের নেতা মনমোহন সিং। কংগ্রেস যে এইসব জানিয়া বুঝিয়াই বিচারাধীন মামলাটিকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে তাহা এখন জলের মতো স্পষ্ট। এই বিষয়টিকে লইয়া কংগ্রেস কয়েকদিন সংসদের কাজকর্ম অচল করিয়া দিয়াছিল। আদালতের বিচারাধীন বিষয় সংসদে কেন—এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে না পারিয়া অন্য একটি বিষয় উত্থাপন করিয়া সংসদের কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। সোনিয়া-রাহুলের আদালতে যাওয়ার বিষয়টি লইয়া হৈ-চৈ না করিবার নির্দেশ কংগ্রেসের পক্ষে দেওয়া হইলেও আদতে যে দলীয় নেতা-কর্মীদের তাহাই করিতে বলা হইয়াছিল এখন তাহা স্পষ্ট।

সোনিয়া-রাহুল এবং অন্য নেতারা যখন আদালতে যাইতেছিলেন তখনই কংগ্রেস দেশের বিভিন্ন স্থানে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করে। আর জামিন পাইবার পর পরই ওই শক্তি প্রদর্শন উল্লাসে পরিণত হয়। এই উল্লাসের কারণ এমন নহে যে সোনিয়া-রাহুল এই মামলা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। আসলে তাঁহারা শুধু জামিন পাইয়াছেন। তাঁহাদের আবার আদালতে যাইতে হইতে পারে। রাজনৈতিক দল মাত্রই প্রতিটি বিষয়ে রাজনীতির গন্ধ খুঁজিতে চায়। কংগ্রেস সেই চেষ্টাই করিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেসী নেতাদের বোঝা উচিত আদালতে বিচারাধীন বিষয়কে জোর করিয়া রাজনীতির বিষয়ে পরিণত করা যাইবে না। প্রথমত এই সময়টা এখন সত্তরের দশক নয় এবং দ্বিতীয়ত দেশের মানুষ এখন আরও সচেতন। যদি সোনিয়া-রাহুলের তৈরি ইয়ং ইন্ডিয়া কোম্পানির ন্যাশনাল হেরাল্ড-এর প্রকাশক অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড-এর অধিগ্রহণে কোনো ত্রুটি নাই বলিয়া মনে হয় তবে কংগ্রেস তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিতেছে না কেন? যদি তাঁহাদের বিচারবিভাগের প্রতি আস্থা থাকে এবং তাহা আছে বলিয়া তাঁহারা দাবিও করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সংসদের কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন কেন আর কেনই বা দিল্লী উচ্চ আদালতের নির্দেশের পিছনে প্রধানমন্ত্রীর হাত দেখিতেছেন? আর কেনই বা অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড-কে নতুনভাবে রূপ দিতে এত ব্যগ্র? এইসব প্রশ্নের উত্তর দিবার পরিবর্তে কংগ্রেস দেশের মানুষকে বোঝাইতে চাহিতেছে যে রাজনৈতিক বদলা লইবার জন্যই তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। আদালতে মামলা দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়া থাকে। আর সময়ের এই সুযোগ লইয়া কংগ্রেস তাহার মিথ্যা দাবির প্রচার চালাইয়া যাইবে—ইহাই কি তাহাদের উদ্দেশ্য? আদলতের বিচারাধীন বিষয়কে রাজনৈতিক ইস্যুতে রূপ দেওয়ার চেষ্টার বিষময় ফল কী হইতে পারে তাহা অন্তত তাহাদের অবিদিত থাকিবার কথা নয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পরিণতি বোধহয় কংগ্রেসেকে স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

সুভাষিতম্

ত্রেতায়াং মন্ত্রশক্তিশ্চ জ্ঞানশক্তি কৃতেযুগে।
দ্বাপরে যুদ্ধশক্তিশ্চ সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌযুগে।। —বেদব্যাস
ত্রেতাযুগে মন্ত্রশক্তি, সত্যযুগে জ্ঞানশক্তি, দ্বাপরযুগে যুদ্ধশক্তি এবং কলিযুগে সঙ্ঘশক্তি কাজ করে।

সমর্থ ভারতের দিকে নয়া পদক্ষেপ

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনতে বরাদ্দ ৬৫ হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গত ১৭ ডিসেম্বর ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল বা ডি এ সি ৬৫ হাজার কোটি টাকা খরচের অনুমোদন দিয়ে দেয়। এই টাকার মধ্যে রাশিয়ার গর্ব বায়ু-প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম / পদ্ধতি কিনতে ব্যয় হবে ৩৯ হাজার কোটি টাকা। পাশাপাশি পিনাকা রেজিমেন্টের জন্য ছ'টি মাল্টি-ব্যারেল রকেট লঞ্চারের জন্য খরচ পড়বে ১৪ হাজার ৬০০ কোটি টাকা এবং পাঁচটি সহযোগী জাহাজ কিনতে খরচ হবে ৯ হাজার কোটি টাকার মতো। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পারিক্করের নেতৃত্বে ডি এ সি-র বৈঠকেও ঠিক হয়েছে যে ৩১০ কোটি টাকা ব্যয়ে সেনাবাহিনী তার জঙ্গি-নিকেশ অভিযানের জন্য ৫৭১টি বুলেট-প্রুফ গাড়ি এবং ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী বিস্ফোরক সামলাতে ১২০টি প্রতিরক্ষা জাল কিনবে। এই জালগুলিও কেনা হবে রাশিয়া

থেকে এবং টি-৭২ ও টি-৯০ ট্যাঙ্কের ক্ষেত্রে এগুলি কাজে দেবে। সব মিলিয়ে দেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করবার জন্য এই অর্থব্যয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল বলে মনে করছেন সমর-বিশেষজ্ঞরা।

তবে ভারতের এই সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্য তাৎপর্যের কথাও বলছেন কূটনীতিজ্ঞরা। ডিসেম্বরের শেষেই মস্কোতে ভারত-রাশিয়া এক শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হতে চলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ভারতের এই অস্ত্র ক্রয় ভারত-রুশ কূটনৈতিক দৌত্যকে অন্য মাত্রা দেবে বলে কূটনৈতিক মহলের বিশ্বাস। যার ফলে আমেরিকা ও চীনকেও অনেকটা চাপে রাখা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্রয় অবশ্যই পূর্বোল্লিখিত ৩৯ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে বায়ু-প্রতিরক্ষা পদ্ধতি কেনা। ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য এস-৪০০ মিসাইল পদ্ধতির ৫ ইউনিট কিনতে ওই বিপুল অঙ্কের টাকা ব্যয় হচ্ছে।

জটিলতর প্রতিরক্ষা অস্ত্র চালনার ক্ষেত্রে এই অত্যাধুনিক মিসাইল খুব কাজের। প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূর থেকে কোনো মিসাইল বা এয়ারক্র্যাফটকে নিশানা করতে এস ৪০০ মিসাইল সিস্টেম সমর্থ বলে জানা গিয়েছে। ২০০৭ সালে এধরনের মিসাইলের প্রথম সূচনা হয়। ঘটনাচক্রে চীন ১০টি এস-৪০০ মিসাইল তৈরির বরাত দিয়েছে রাশিয়াকে। সেদিক দিয়ে ভারতের এই সুচিন্তিত পদক্ষেপ কার্যকরী হওয়া অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করা হচ্ছে। এই মিসাইলের দর অবশ্য এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সমঝোতার ভিত্তিতে এর দর চূড়ান্ত হয়। আগামী ভারত-রুশ শীর্ষ বৈঠকে এটা ঠিক হতে পারে বলে খবর।

ডি এ সি পিনাকা রেজিমেন্টের জন্য যে ছ'টি মাল্টি ব্যারেল রকেট লঞ্চার কেনা নিশ্চিত করে ফেলেছে, সেগুলি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' শ্রেণীভুক্ত। অন্যদিকে, জম্মু-কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জন্য যে ৫৭১টি বুলেটপ্রুফ যানের জোগাড় করতে চলেছে ভারত, সেগুলি 'বাই ইন্ডিয়ান' শ্রেণীভুক্ত। বিদেশের পাশাপাশি কেন্দ্রের এই প্রকল্পে যুক্ত হচ্ছে ডি আর ডি ও (ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন), বি ই এল (ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড), হ্যাল (হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিমিটেড) প্রভৃতি দেশীয় সংস্থা।

কোলাঘাটে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির জিভ কেটে নিল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানার শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড মারধোর করে তার জিভ কেটে নেয় কয়েকজন দুষ্কৃতী। সূত্রের খবর, গত ২০ ডিসেম্বর দুপুর ২টা নাগাদ মানসিক ভারসাম্যহীন বিজয় দোলইকে পাশের শ্রীকৃষ্ণপুর কলোনির আবদুল রহিম আলি, সাহালাম আলি, সাদ্দাম আলি, মহিম আলি, শেখ সাহাবুল, শেখ কালা, শেখ গোরা-সহ আরো কয়েকজন তাঁর বাড়িতে এসে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড মারধোর করে জিভ কেটে নেয়। বাধা দিতে গেলে বিজয় দোলইয়ের দাদা অজয় দোলই-সহ বাড়ির মেয়েদেরও মারধোর করে তারা।

ঘটনার কথা জানাজানি হতেই প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলে অজয় দোলই ভাইকে উদ্ধার করতে শ্রীকৃষ্ণপুর কলোনিতে যান। সেখানেও তাদের লোহার রড, লাঠি ও ইট-পাথর দিয়ে আক্রমণ করে দুষ্কৃতীরা। তাতে তরুণ মল্লিক ও শম্ভুনাথ মল্লিক দুই প্রতিবেশী গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ বিজয় দোলইকে উদ্ধার করে তমলুক হাসপাতালে ভর্তি করে। দাদা অজয় দোলই দুষ্কৃতীদের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

সামান্য অজুহাতে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে নির্মমভাবে জখম করায় গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফুসছেন বলে জানা যায়। অভিযোগ, এলাকায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই ঘটনায় পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

শহিদের সম্মানে ভূষিত চুড়কা মুর্মু

তরুণ কুমার পণ্ডিত ॥ অবশেষে শহিদের সম্মান পেলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক বালুরঘাটের চকরাম শাখার মুখ্যশিক্ষক চুড়কা মুর্মু। গত ১২ ডিসেম্বর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জার্নালিস্ট ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠানে চুড়কা মুর্মুকে 'বিরলতম দেশপ্রেমিক' আখ্যা দিয়ে শহিদের সম্মান দেওয়া হয়। চুড়কা মুর্মুর প্রতি সম্মান-জ্ঞাপক স্মারক তাঁর বৌদি রামধন সোরেনের হাতে তুলে দেন বিধায়ক বিপ্লব মিত্র। শনিবার ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অমলকান্তি রায়, জেলা আদালতের সরকার পক্ষের আইনজীবী সুভাষ চাকী প্রমুখ। যদিও এটি সাংবাদিক সংগঠনের পক্ষ থেকে চুড়কা মুর্মুকে শহিদের সম্মান জানানো হলো, এলাকার মানুষদের আশা, এবার হয়তো চুড়কার পরিবারের দিকে সরকারের নজর পড়বে।

কয়েক বছর আগেও বেঁচে ছিলেন চকরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হরেন্দ্রনাথ চাকলাদার। চুড়কা মুর্মুর শিক্ষক। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের সময় খান সেনারা ১৮ আগস্ট সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়েছিল চকরাম গ্রামে। সবাই যখন গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ওই গ্রামের শাখার মুখ্য শিক্ষক একাদশ শ্রেণীর চুড়কাকে তাঁর মাস্টারমশাই পালানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু চুড়কা পরামর্শে কান না দিয়ে বিএসএফ-কে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যান। বিএসএফের গোলাবারুদ ভর্তি বাক্স নিয়ে চুড়কা সীমান্তের দিকে এগিয়ে যান প্রাণের মায়া না করে। কিন্তু খানসেনার হাতে বিএসএফ-রা বন্দী হলে গোলাবারুদের বাক্স পুকুরে ফেলে দিতে শুরু করেন। বাক্স ফেলার শব্দ শুনে খানসেনারা গুলি চালাতে শুরু করলে সেই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় চুড়কার শরীর। পরের দিন তার মৃতদেহ ভেসে ওঠে পুকুরের জলে। ঘটনার পরে কেটে গেছে প্রায় ৩৫টি বছর। 'মুর্মু স্মৃতিরক্ষা কমিটি' তৈরি করে প্রতি বছর ১৮ আগস্ট তাঁর স্মরণে গ্রামবাসী একটি ছোট্ট অনুষ্ঠান করে থাকেন। ব্যাস, এই পর্যন্তই। সেই মাস্টারমশাই মৃত্যুর আগের বছর পর্যন্ত চুড়কার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে চোখের জল আটকাতে পারতেন না। বলতেন, সেদিন বুঝিনি, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম যে, সেদিন আমাকে জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিল ওই বনবাসী ছাত্রটি।

চুড়কা মুর্মুর বৌদির হাতে সম্মান জ্ঞাপন স্মারক তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক বিপ্লব মিত্র

বীরের মতো মৃত্যুর পরেও স্বীকৃতি দেয়নি কোনো সরকার। তাঁর আত্মবলিদানের কোনো উল্লেখটুকুও নেই জেলার সরকারি নথিতে। সরকার নয়, একটি সাংবাদিক সংগঠনের উদ্যোগে এই সম্মান সত্যি বিরল দৃষ্টান্ত। তবু প্রশ্ন কিছু থেকেই যায়। অনেকেই তো দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাতারাতি স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়ে পেনশন নিচ্ছেন। কিন্তু স্বাধীন দেশে বিদেশি হানাদারের হামলায় যে কিশোর না পালিয়ে প্রাণ দিয়েছিল অকাতরে, তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর বলেই কি এত বছরেও তাঁর কপালে জোটেনি শহিদের সম্মানটুকু? এই প্রশ্ন প্রতি বছর ১৮ আগস্ট ফিরে আসে চকরাম গ্রামবাসীদের মনে। দেরিতে হলেও একটি বেসরকারি সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশ মাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গ করা চুড়কা শহিদের সম্মান পেলেন, তাতে গ্রামবাসীরা সত্যিই গর্বিত।

আমেরিকায় প্রশ্নের মুখে মুসলমানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প প্যারিস ও ক্যালিফোর্নিয়ার সন্ত্রাস- হানার প্রেক্ষিতে দাবি তুলেছেন, মার্কিন সীমান্ত মুসলমানদের জন্য বন্ধ হোক। তাঁর বিরোধী ডেমেক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিন্টন অবশ্য এই প্রসঙ্গে ট্রাম্পকে কটাক্ষ করে বলেছেন, আই এস-এর হয়ে জঙ্গি নিয়োগের কাজটা তিনি ভালভাবেই করে দিচ্ছেন। কিন্তু ঘটনা হলো, সেদেশের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা অনুসারে, ৫৯ শতাংশ রিপাবলিকান সমর্থক মনে করে মুসলমানদের উপর সাময়িক হলেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা দরকার। ১৫ শতাংশ ডেমোক্রেট এবং ৩৮ শতাংশ নির্দল সমর্থকও ট্রাম্পের মতকে সমর্থন করেছেন। আমেরিকায় মুসলমানরা অন্য নাগরিকদের সঙ্গে যে স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধা পান, তা এখনই কমিয়ে দেওয়ার পক্ষে তারা প্রকাশ্যেই দরবার করছেন। যাঁরা ট্রাম্পের বক্তব্যের বিরোধিতা করছেন, তাদেরও মুসলমানদের নিয়ে অনেক সন্দেহ আছে। আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একটা রীতি আছে যেখানে জিওপি অর্থাৎ 'গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টি'-র প্রার্থী পদের অভিলাষীরা জনসমক্ষে পরস্পরকে যুক্তি-তর্কে অপদস্থ করতে চায়। এই বিতর্কে কিন্তু ট্রাম্পের অভিমতই প্রতিফলিত হয়েছে। মুসলমান জনসমাজ যে মার্কিন নিরাপত্তার প্রশ্নে একটা বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন, তারা তা অস্বীকার করেন না।

দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে ভারতকে হুঁশিয়ারি চীনা রাষ্ট্রদূতের, পাল্টা বিজেপি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দক্ষিণ চীন সাগরে খবরদারি বাড়াতে এবার সরাসরি হুমকির পথে হাঁটলো চীন। অবশ্য চীনের শীর্ষ স্তর থেকে নয়, এই হুমকির কথা শোনা গিয়েছে তাদের এক উচ্চপদস্থ আমলার থেকে। যার পেছনে চীন সরকারের মদত এবং চীনের দখলদারি নীতির স্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছেন কূটনীতিজ্ঞরা। 'দ্য এশিয়া প্যাসিফিক কান্ট্রি : ইন্ডিয়া অ্যান্ড বিগ পাওয়ার এনগেজমেন্ট' শীর্ষক ডেকান হেরাল্ড কথোপকথনে গত ১৯ ডিসেম্বর ভারতে চীনা রাষ্ট্রদূত লি ইউচেঙ মন্তব্য করেন : 'দক্ষিণ চীন সাগরের বহির্ভূত দেশগুলি যাদের এই অঞ্চলের ব্যাপারে করণীয় কিছু নেই; এখানকার কোনো ব্যাপারে তাদের নাক গলানো উচিত নয়। তাহলে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে। আঞ্চলিক নিরাপত্তার খাতিরে বাহুবল প্রদর্শনের কোনো সুফল নেই।'

স্বভাবতই ইউচেঙ্-এর এই মন্তব্যে ঝড় উঠেছে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে। তাঁর বক্তব্যের মূল লক্ষ্য যে ভারত ও আমেরিকা, তা বুঝতে কারোর বাকি নেই। যদিও একমাত্র বিজেপি বাদে '৬২-র স্মৃতি উস্কে বাকি সব রাজনৈতিক দলই এক্ষেত্রে মুখে কুলুপ এঁটেছে। বিজেপি মুখপাত্র রামমাধব বলেছেন, 'ভারতে যেমন ভারত মহাসাগর বিরাজ করে না এবং বিশ্বের অন্যান্য কিছু দেশের অংশীদার সেই মহাসাগরটি, তেমনি দক্ষিণ চীন সাগরের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। চীন যদি এই শতকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিকে চালনা করতে চায় তবে দক্ষিণ চীন সাগরে শান্তি ফেরানোই তাদের আশু কর্তব্য হবে। নচেৎ আন্তর্জাতিক অর্থনীতিকে তাদের চালনা করার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

উবাচ

"সাধারণ মানুষও অসাধারণ কিছু করতে পারে। এজন্য তাদের উপর আস্থা স্থাপন, উৎসাহ ও ক্ষমতা দেওয়া দরকার। আমাদের মতো বিশাল ও বৈচিত্র্যময় দেশে, কয়েকজন মহামানব বা মানবী জাতির পরিবর্তন করতে পারে না।"

আই এ এস এবং আই পি এস অফিসারদের কাছে সাম্প্রতিক বক্তৃতা প্রসঙ্গে।

আজিম প্রেমজী
উইপ্রো-র চেয়ারম্যান

"আপনারা আপনাদের অহমিকা বর্জন করে দেশের উন্নতির জন্য এগিয়ে আসুন। এর জন্য যথেষ্ট রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলিকে বোঝানো এবং ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি যার মধ্যে জিএসটি এবং অন্যান্য ইস্যুও থাকবে তা নিয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে দিতে হবে।"

(ফিকি-র) ৮৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভায়।

এ কে সিকরি
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি,

"ভারতীয়দের দেওয়া করের অর্থেই আই আই টি-তে পড়াশোনার জন্য ভরতুকি দেওয়া হয়। অথচ এখানকার পড়ুয়াদের প্রযুক্তির জ্ঞান থেকে লাভবান হচ্ছে আমেরিকা ও ইউরোপের মতো দেশগুলি।"

ফেসবুকে একটি পোষ্টে।

মার্কণ্ডেয় কাটজু
সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি

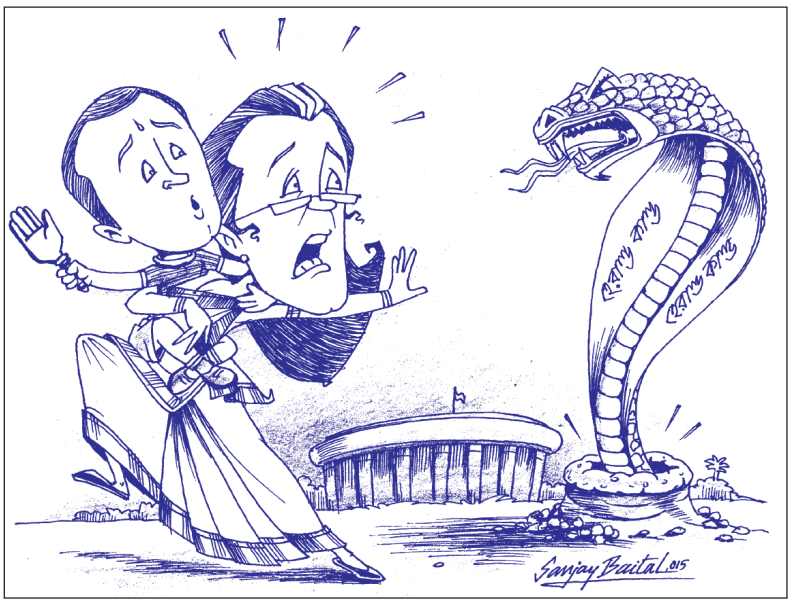

শঙ্কুর ত্রিশঙ্কু দশা

প্রিয় শঙ্কুদেব পণ্ডা
সিবিআই দপ্তর
সিজিও কমপ্লেক্স, বিধাননগর

আপনাকে যে এখন কী সম্বোধন বা পরিচয় দেওয়া যায় তা ভেবে পাচ্ছি না। ছিলেন সাংবাদিক। আচমকা ভোল পাল্টে চলে এলেন রাজনীতিতে, 'পিসি'র ডাকে সাড়া দিয়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর সাংবাদিকরা 'দিদি' ডাকলেও আপনি ডাকতেন 'পিসি'। এমনকী ভাইপো অভিষেকও প্রকাশ্যে 'দিদি' ডাকে। যাই হোক, ক্ষমতার ভরকেন্দ্রের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে রাজ্যের ছাত্র-রাজনীতি তথা তামাম শিক্ষার আঙিনায় অনন্য পরাক্রমে ছড়ি ঘোরালেন। রাতারাতি ডাকাবুকো নেতা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি। তাঁর ভয়ে কাঁপতেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা-ব্যক্তিরা। তারপর আবার সেখান থেকেই রাতারাতি হয়ে গেলেন দলের সাধারণ সম্পাদক। এখন অবশ্য কিছুই নন। দলে আদৌ আছেন কিনা আপনিও মনে হয় জানেন না। ঠিকানাও তো জানা নেই। তাই সিবিআই দপ্তরের ঠিকানাতেই চিঠি পাঠালাম। সেখানে তো আপনাকে যেতে আসতে হবেই। সুতরাং পেয়ে যাবেন।

কিন্তু আপনি নুন খেয়ে নেমকহারামি করলেন কেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে কেন অভিষেকের নামটা বলে দিলেন বলুন তো! আপনি জানাননি, সিবিআইও জানায়নি কিন্তু দিদির কাছে সব খবর আছে। সিবিআই অবশ্য মিডিয়াকে জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় আপনি কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সারদা ও রোজভ্যালি থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়েছিলেন। একই সঙ্গে আপনি বলেছেন, নিজের জন্য নয়, রাজ্যের সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক কাজের জন্যই ওই টাকা নিয়েছিলেন। যার একটা অংশ খরচ হয়েছে দলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। বাকিটা অরাজনৈতিক অনুষ্ঠানে। সিবিআই সূত্রের খবর, এই কথা বলার পরে আপনাকে প্রশ্ন করা হয়, টাকা নেওয়ার বিষয়টি কি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব জানেন? তদন্তকারীদের দাবি, আপনি জবাবে বলেন, শীর্ষ নেতৃত্বের অনুমতি নিয়েই তিনি ওই টাকা নিয়েছিলেন।

সাংবাদিক থেকে রাজনীতিক। পেশা-জীবনে এহেন উল্কার মতো উত্থানের পাশাপাশি 'বৈষয়িক' ক্ষেত্রেও আপনার তাক লাগানো পরিবর্তন নিয়ে কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) খোঁজ-খবর শুরু করেছে বলে শুনলাম। সাধারণ টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক থেকে রাজনীতির পাণ্ডা হয়ে ওঠা। সেটা তো ভাবাবেই। পেশা বদল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই 'পিসি' অর্থাৎ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম টেনে আনেন আপনি। সিবিআইকে জানিয়েছেন শুনলাম তৃণমূলনেত্রীর নির্দেশেই আপনার রাজনীতিতে পদার্পণ। সত্যি কথা হলেও এমন কথা কেউ বলে। দিদির কান কোথায় কোথায় আছে আপনি তো ভালোই জানেন।

রাতারাতি ডাকাবুকো হওয়া শিল্পী শুভাপ্রসন্নর মালিকানাধীন 'এখন সময়' চ্যানেলে অন্যতম শীর্ষপদে আপনি কাজ করতেন। বেতন হিসেবে মোটা অঙ্কের টাকাও নিতেন বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু রহস্যের ব্যাপার হলো, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নথি ঘেঁটে 'দেবকৃপা ব্যাপার লিমিটেড' (চ্যানেলটির মালিক সংস্থা)-এর সঙ্গে কোনো লেনদেনের তথ্য মেলেনি এবং এরই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠেছে, তা হলে কি নগদ টাকায় বেতন নিতেন? নিয়ে থাকলে সে টাকা দিয়ে আপনি কী করেছেন? আপনার আদি বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি শহরে। পরিবার সেখানেই থাকেন কিন্তু নিজের কলকাতার ঠিকানা জানাতে গিয়ে আপনি নাকি থতমত খেয়ে যান। বরাহনগর-বেলঘরিয়া অঞ্চলের একটা ঠিকানা দেন। শোনা যাচ্ছে বাইপাসের ধারেও একটা ফ্ল্যাট আছে আপনার।

আপনার আসল ঠিকানা তো কাঁথির আঠিলাগোড়ির সাতমাইলে। আপনারা বাবা মৃগাঙ্ক পাণ্ডা অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারি পরিবহণ-কর্মী। বছর দশেক আগে পর্যন্ত ওখানকার একটি দোতলা বাড়ির ভাড়াটে ছিলেন আপনারা। এখন শুনছি সে বাড়ি কিনে নিয়ে ২০১২-য় আপাদমস্তক সংস্কার করা হয়। তিনতলাও বানিয়ে নিয়েছেন। ঘরে ঘরে এসি মেশিন বসেছে। দামি দামি আসবাব।

এত পয়সা কোথায় পেলেন শঙ্কুদেব? জানি জানি, আপনার দলের দাদাদের মতোই আপনিও করে নিয়েছেন। কিন্তু এখন কী করবেন? সাধারণ সাংবাদিক আর রাজনীতিকের পার্থক্য তো আছেই। কটা টাকাই বা মাইনে পেতেন? কিন্তু তাতেই এত সাফল্য? ভাবাচ্ছে শঙ্কুদেব ভাবাচ্ছে। আপনার অর্থাগমের সূত্র নিয়ে নয়, ভাবাচ্ছে আপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে। দিদি ফের মুকুল রায়কে কাছে টানছেন। সাত কাণ্ড রামায়ণের পর বলছেন, মদন চোর তিনি নাকি বিশ্বাসই করেন না। আর আপনার বেলায় বেমালুম চুপ। 'পিসি'র আশীর্বাদ আবার কবে পাবেন সেই অপেক্ষায় থাকবেন, নাকি রাজসাক্ষী হয়ে তদন্তে সাহায্য করবেন? ভাবুন প্রফেসর শঙ্কু ভাবুন। সময় খুবই কম।

— **সুন্দর মৌলিক**

মমতার চোখে কে চোর আর কে সৎ বোঝা দুষ্কর

গূঢ় পুরুষের কলম

একটা বিষয় আমাকে খুব অবাক করে। কোথাও কোনো দুর্নীতির দায়ে কেউ অভিযুক্ত হলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তড়িঘড়ি তার সমর্থনে বিবৃতি দেন। আর্থিক দুর্নীতির এত বড় সমর্থক সারা দেশে আর কেউ নেই। সম্প্রতি দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি রাজিন্দর কুমারের অফিসে তল্লাসি চালায় সিবিআই। পরে রাজিন্দরের অফিস ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেয় সিবিআই। ঘটনাচক্রে রাজিন্দরের অফিস ঘরের লাগোয়া অন্য একটি ঘরে বসেন দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী। সংবাদমাধ্যম রটিয়ে দিল যে সিবিআই দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। এই রটনার কারণ মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল নিজেই টুইট করে জানান যে সিবিআই তার অফিসে হানা দিয়েছে। সিবিআই কর্তারা সাংবাদিক বৈঠক ডেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে আই এ এস অফিসার রাজিন্দর কুমারের বাড়িতে তল্লাসি চালিয়ে তিন লক্ষ টাকা মূল্যের মার্কিন ডলার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁর অফিসেও হানা দেওয়া হয় কিছু ফাইলের সন্ধানে। কংগ্রেসের শীলা দীক্ষিত যখন দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তাঁর বিশেষ স্নেহধন্য এই আমলা ছিলেন শিক্ষা সচিব। সরকারি পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাজিন্দর তাঁর নিজের বেনামা সংস্থাকে কোটি কোটি টাকার তথ্য প্রযুক্তির বরাত পাইয়ে দেন। এ' সবই হয় শীলা দীক্ষিতের জ্ঞাতসারে। সম্ভবত সেই কারণেই দিল্লীর অ্যান্টি করাপসন ব্যুরোতে রাজিন্দরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের ফাইলটি চেপে দেওয়া হয়। কোনো তদন্ত হয় না। কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর দিল্লীর দু'জন আই এ এস অফিসার রাজিন্দর কুমারের আর্থিক দুর্নীতির বিষয়টি লিখিতভাবে সিবিআই কর্তাদের জানান। এও জানান যে, মূল অভিযোগটি প্রমাণপত্র-সহ দিল্লীর অ্যান্টি করাপসন ব্যুরোতে পড়ে আছে। সরকারি পদস্থ অফিসার থাকাকালে তিনি যে তিনটি বেসরকারি ব্যবসায়িক সংস্থা চালাচ্ছেন সেই ব্যক্তিগত ফাইলগুলি তিনি তাঁর অফিসে রেখেছেন। নির্দিষ্ট এই তথ্য জানার পর সিবিআই রাজিন্দরের অফিসে হানা দেয় এবং সেই ব্যবসায়িক লেনদেনের ফাইলগুলি বাজেয়াপ্ত করে।

রাজিন্দর কুমারকে বাঁচাতে মাঠে নামেন প্রথমে স্বয়ং অরবিন্দ কেজরিওয়াল। পরেই সানাইয়ের পোঁ ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মালদা সফরের ফাঁকে হুঙ্কার দেন যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই সিবিআই-কে দিয়ে বিজেপি-বিরোধীদের চমকানো হচ্ছে। সংসদে একমাত্র তৃণমূল সাংসদরাই সিবিআই হানার বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়েছেন। রাজ্যসভায় দলের নেতা ডেরেক ও 'ব্রায়েন কিছু না জেনে না বুঝে বলে দিলেন, 'দেশে এখন অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে।' ইন্দিরার ঘোষিত জরুরি অবস্থার সময় ডেরেক সাহেবের বয়সটা ছিল কত? রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কও ছিল না। যাইহোক, দুর্নীতির সমর্থনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঙ্কার গর্জন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই থেমে গেছে। কারণ, সারা দেশে তিনি নীতীশকুমার ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাজনীতিককে পাশে পাননি।

মমতাদিদি বলেছেন, মদন মিত্র চোর এমন কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। বিনা দোষে একজন সৎ সরল ভালমানুষ নেতাকে অন্যায়ভাবে সিবিআই জেল হেফাজতে রেখেছে। অথচ দিদি জানেন যে সিবিআই নয়, আদালতের নির্দেশেই মদন মিত্র জেলে বাস করছেন। কলকাতার সাংবাদিকরা জানেন যে কুণাল ঘোষ সহজ সরল ব্যক্তি নন। কোনোদিনই ছিলেন না। সারদা সংস্থায় তাঁর প্রভাব এবং ক্ষমতা ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রচুর সুবিধা সুযোগ নিয়েছেন। যা কোনো যথার্থ সাংবাদিকের প্রাপ্য ছিল না। এই কুণাল ঘোষও একদা মমতার চোখে সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। পরে মমতার রাজনৈতিক শত্রু সোমেন মিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে কুণাল ঘোষ মমতার চোখের বালি হন। দিদি এখন বলছেন, কুণাল চোর, মদন সৎ। তৃণমূল এমন একটা দল যেখানে পরিচ্ছন্ন ভদ্র শিক্ষিত মানুষ নেই বললেই চলে। আমি অন্তত একজনও ভদ্র বিনয়ী মানুষকে তৃণমূলে দেখিনি। দিদির ঘনিষ্ঠ টালিগঞ্জের সুন্দরী অভিনেত্রীদের দখলের লড়াই চলছে ছাত্র ও যুব নেতাদের মধ্যে। দিদি দলের নেতাদের সতর্ক করছেন যে, তোলাবাজি চলবে না। নেতারা দুটো পয়সার মুখ দেখতে তৃণমূলী হয়েছেন। তোলাবাজি বন্ধ করতে বললেই বন্ধ করা যায় না। দলের যুবনেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা সারদা থেকে এক কোটি টাকা পেয়েছেন বলে সিবিআইয়ের অভিযোগ। শোনা যাচ্ছে দীর্ঘ জেরার সময় সে কথা শঙ্কুদেব স্বীকারও করেছেন।

তবে অভিযোগটির সত্যি বা মিথ্যে যাচাই করার আগেই দিদি দলের সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে বেচারাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ দিদি বিশ্বাস করেন শঙ্কুদেব চোর। মমতার চোখে কে চোর আর কে সৎ বোঝা দুষ্কর। যেমন, দিল্লীর যে আই এ এস আমলা রাজিন্দর কুমারের সমর্থনে দিদি হুঙ্কার দিচ্ছেন। সেই ব্যক্তিটি তাঁর কর্মজীবনের ১২ বছরে ৫০ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হয়েছেন।■

পণ্যপরিষেবা কর : আশা ও আশঙ্কা : ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

অম্লানকুসুম ঘোষ

চতুরাশ্ববাহিত রথ সারথির অঙ্গুলিবদ্ধ রজ্জুর সামান্য হেলনে তার গতিপথ ও বেগ পরিবর্তন করে। কারণ রথের মূল চালিকাশক্তি অশ্বের গতিপথ ও বেগ নির্ভর করে সারথির সামান্য অঙ্গুলির ওপর। তার অঙ্গুলিনিয়ন্ত্রণে সামান্য ভুলত্রুটি যেমন রথের পতন নিশ্চিত করতে পারে, তেমনই একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সার্বিক উন্নতি করে সেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্ণধার বা নীতিনির্ধারকদের ওপর। তাই কোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ কেমন হবে তা জানতে হলে সেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্ণধার বা নীতিনির্ধারকদের বর্তমান কর্মপ্রণালীকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। বর্তমান ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও রাজ্য সরকারগুলি অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করেন। তাই এই প্রতিষ্ঠানগুলির সকল পদক্ষেপেই নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা উচিত দেশের যে কোনো অর্থনীতি সচেতন মানুষের। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের এরকমই একটি সম্ভাব্য পদক্ষেপ হলো জিএসটি বিল বা পণ্যপরিষেবা কর বিল।

জিএসটি-র সম্পূর্ণ কথাটি হলো ‘গুডস এন্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স’ বা পণ্যপরিষেবা কর। বিলটির সারমর্ম হলো দেশের সর্বত্র সমস্ত রকম বস্তু এবং পরিষেবার জন্য একই হারে কর বর্তমান থাকা। অর্থাৎ বর্তমানে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম বস্তু এবং পরিষেবার জন্য পৃথক পৃথক করের যে ব্যবস্থা আছে তা আর বজায় থাকবে না। এই আপাতসরল কথাটির আড়ালে দেশের কর-ব্যবস্থা, শিল্পনীতি ও সামগ্রিক অর্থনীতির আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

জিএসটি বা পণ্যপরিষেবা করের সুফল মূলত তিনটি। প্রথমত, সারা দেশের অভিন্ন করকাঠামো থাকার ফলে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা ভারতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে। কারণ বিশেষ কোনো বিনিয়োগকারী কোনো একটি বড় শিল্পে কাঁচামাল উত্তোলন পর্যায় থেকে শুরু করে বিপণন পর্যায় পর্যন্ত সম্পূর্ণ বাণিজ্যিচক্রটিকে নিজের হাতে রাখতে চায় (অবশ্যই নিজেদের লভ্যাংশ বৃদ্ধির তাগিদে)। তাহলে তাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে উত্তোলন, উৎপাদন ও বিপণন ক্ষেত্র স্থাপন করতে হবে। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রদেশে করকাঠামো আলাদা হলে বিনিয়োগকারীর অসুবিধা এবং গোটা দেশে অভিন্ন করকাঠামো হলে তাদের সুবিধা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ওড়িশা থেকে আকরিক লোহা, ঝাড়খণ্ড থেকে কয়লা, ভিজিয়ানগ্রাম থেকে অভ্র নিয়ে ছত্তিশগড়ের কোনো কারখানায় জিনিস তৈরি করে তা দিল্লীর বাজারে বিক্রি করে এবং কলকাতা ও মুম্বইয়ের বন্দর দিয়ে রপ্তানি করে অধিক লভ্যাংশ পকেটজাত করার ক্ষেত্রে বড় অসুবিধা হিসেবে দেখা দেবে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, দিল্লী, মহারাষ্ট্রের আলাদা করকাঠামো। গোটা দেশে অভিন্ন করকাঠামো এই অসুবিধাটাই দূর করে, ফলে বিনিয়োগকারী লাভবান হয়। এই লাভ শুধুমাত্র বিনিয়োগকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, মুনাফাকর এবং আয়করের মাধ্যমে এই লাভের একটা অংশ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের হাতে আসে যা সরকারি আয়ব্যয় ঘাটতি (fiscal deficit) কমাতে সাহায্য করে। ফলে দেশের বাণিজ্যিক সূচ্যাঙ্ক বৃদ্ধি পায় এবং সরকারের হাতে বাড়তি টাকা থাকে খরচ করার মতো যার দ্বারা সরকারের যোজনাখাতে ও সামাজিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যার ফলে যথাক্রমে দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ও মানবসম্পদের উন্নতি ঘটায় যা অর্থনীতিতে নবযুগের উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগকারীদের লাভ হলে অন্য বিনিয়োগকারীরাও বিনিয়োগে আগ্রহী হবে, ফলে বিনিয়োগ বাড়বে। তার ফলে কর্মসংস্থানের

“বিলটির সারমর্ম হলো দেশের সর্বত্র সমস্ত রকম বস্তু এবং পরিষেবার জন্য একই হারে কর বর্তমান থাকা। অর্থাৎ বর্তমানে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম বস্তু এবং পরিষেবার জন্য পৃথক পৃথক করের যে ব্যবস্থা আছে তা আর বজায় থাকবে না। এই আপাতসরল কথাটির আড়ালে দেশের কর-ব্যবস্থা, শিল্পনীতি ও সামগ্রিক অর্থনীতির আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।”

ফঃ ২

বৃদ্ধি ঘটবে যার দ্বারা (চাহিদা বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি, পুনরায় কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি, পুনরায় চাহিদা বৃদ্ধি, পুনরায় উৎপাদন বৃদ্ধি) এই অর্থনৈতিক উন্নতি-চক্রের মধ্যে দেশ প্রবেশ করে। সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি তখন শুধু সময়ের অপেক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয়ত, এতদিন কর ধার্য করত রাজ্যসরকার। কোনো একটি রাজনৈতিক দল বা জোটের দ্বারা পরিচালিত রাজ্যসরকার দ্বারা ধার্য করা করব্যবস্থা সেই রাজনৈতিক দল বা সেই জোটের অন্তর্ভুক্ত সকল রাজনৈতিক দলের স্বার্থানুসারী করব্যবস্থা প্রচলন করে। অর্থাৎ যে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সেই রাজনৈতিক দল বা দলসমূহের সহায়তা করে সেই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে বা তাদের পছন্দের ক্ষেত্রকে বিশেষ করছাড় দেয়। পণ্যপরিষেবা কর চালু হলে সেই দুর্নীতির সম্ভাবনা দূর হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, তখন রাজ্যে আসীন রাজনৈতিক দলের দুর্নীতির বদলে কেন্দ্রে আসীন রাজনৈতিক দলের দুর্নীতির শুরু হবে না তো? এই প্রশ্নটির উত্তর লুকিয়ে আছে বিলটির গঠনতন্ত্রেই। আপাতদৃষ্টিতে কেন্দ্রীভবন বলে মনে হলেও এই বিলটি বিকেন্দ্রিকরণের পথে এক বিরাট পদক্ষেপ। এই বিলে রাজ্যসরকারের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিলেও সেই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করেনি, বরং এক স্বশাসিত এবং স্বচালিত কমিটির (জিএস কমিটি) হাতে এই করনির্ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করেছে। সেই কমিটি গঠিত হয়েছে দেশের সবকটি রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে এবং সেই কমিটির প্রধান হলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। সেই কমিটির সিদ্ধান্ত স্থির হবে কমিটির সদস্যদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা। অর্থাৎ কোনো একটি রাজনৈতিক দল বা জোটের দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছানুসারে এই কমিটির সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হবে না।

পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দ্বারা গঠিত বিভিন্ন রাজ্যসরকারের অর্থমন্ত্রীদের দ্বারা গৃহীত এক মিলিত সিদ্ধান্তের দ্বারা নিজের চলার পথ স্থির করবে এই কমিটি। ফলস্বরূপ ক্ষমতার একমুখীনতা কমবে, যার দরুন দুর্নীতির সুযোগ ও সম্ভাবনাও কমবে। বহুমতের সমন্বয়ে সমন্বিত কমিটির সিদ্ধান্ত হবে স্বচ্ছ ও যুক্তিনিষ্ঠ।

কিন্তু পণ্যপরিষেবা কর বিলের সবটাই যে অর্থনীতির পক্ষে সুফলপ্রদানকারী তা নয়। গণতান্ত্রিক পথে এই বিলে বহুমতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কিন্তু গণতান্ত্রিক আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের মতো এখানেও 'বহুমতে'র 'বহুর মতে' পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ষোল আনা। অর্থাৎ মোট ২৬টি রাজ্যকে বাধ্য হয়ে তা মেনে নিতে হবে। এখানেই সমস্যার উৎপত্তি। ভারতের মতো প্রাকৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যসমন্বিত দেশে প্রত্যেক রাজ্যেরই খনিজ, বনজ, কৃষিজ ও জনগোষ্ঠীগত পৃথক বৈশিষ্ট্য বর্তমান। অনেক সময়েই সেই বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে পারস্পরিক মিল তো নেই-ই, বরং তাদের পরস্পরের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান কখনো কখনো আপাত বৈপরীত্যও বর্তমান। সেই বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখে প্রত্যেক রাজ্যকেই তার জনসংখ্যার একটি অংশকে বাঁচানোর জন্য বিশেষ ধরণের খনিজ, বনজ ও কৃষিজ পণ্যে এবং বিশেষ ধরনের পরিষেবায় করের হারে বিশেষ ছাড় দিতেই হয়। এই বিশেষ ধরনের পণ্য ও পরিষেবাগুলির মোট উৎপাদনমূল্য দেশের সামগ্রিক জিডিপির তুলনায় নগণ্য হওয়ায় এবং অন্য রাজ্যের ছাড়যোগ্য বিশেষ পণ্য ও পরিষেবার সঙ্গে মিল না থাকায় এই ছাড় গুলি জিএসটি কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা পাশ করানো কঠিন। আবার কিছু পণ্য ও পরিষেবা আছে যেগুলি উৎপাদন ও বিপণন অনুসারে অতটা প্রান্তিক বা এক রাজ্য-নির্ভর না হলেও একটি বিশেষ অঞ্চল-নির্ভর, যেমন (কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে) দেশের পূর্বাঞ্চলের চা (পশ্চিমবঙ্গ ও অসম), দক্ষিণাঞ্চলের কফি (তামিলনাড়ু ও কেরল), পশ্চিমাঞ্চলের তুলো (মহারাষ্ট্র ও গুজরাত) ও উত্তরাঞ্চলের আপেল (হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর ও উত্তরাখণ্ড) আবার (খনিজ পণ্যের ক্ষেত্রে) উত্তরাঞ্চলের অভ্র (উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড), পূর্বাঞ্চলের বক্সাইট (ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড) প্রভৃতি। এইসব পণ্য এবং তার থেকে উৎপন্ন অন্যান্য পণ্য ও পরিষেবা তাদের সামগ্রিক বিক্রয়মূল্যে যথেষ্টই ওজনদার, কিন্তু একটি অঞ্চল বাদ দিয়ে দেশের অন্যত্র এদের কোনো প্রভাব নেই। ফলে এদের জন্য প্রয়োজনীয় কর ছাড়ও জিএসটি কমিটিতে পাশ করানো কঠিন। শুধু তাই নয়, এদের নিয়ে রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাত বাধাও বিচিত্র নয়।

সমস্যা যেমন আছে, তার সমাধানও আছে। দেশের সমস্ত পণ্য ও পরিষেবাকে তিনভাগে ভাগ করা উচিত। তার প্রথমভাগ যার মধ্যে থাকবে সেইসব পণ্য ও পরিষেবা যেগুলির উৎপাদন, পরিনির্মাণ ও বিপণন দেশের সর্বত্র হয় (এগুলির করকাঠামো নির্মাণের ভার থাকা উচিত জিএসটি কমিটির হাতে)। দ্বিতীয়ভাগে সেইসব পণ্য ও পরিষেবা যেগুলির উৎপাদন, পরিনির্মাণ ও বিপণন একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ (এগুলির করকাঠামো নির্মাণের ভার থাকা উচিত জিএসটি কমিটির অধীনস্থ সাব-কমিটির হাতে)। তৃতীয়ভাগে সেইসব পণ্য ও পরিষেবা যেগুলির উৎপাদন, পরিনির্মাণ ও বিপণন একটি বিশেষ রাজ্যে সীমাবদ্ধ (এগুলির করকাঠামো নির্মাণের ভার থাকা উচিত সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাতে)। কোন পণ্য ও পরিষেবা কার হাতে থাকবে তা নিয়ে উপযুক্ত অর্থনৈতিক গবেষণা ও বিতর্ক প্রয়োজন।

কিন্তু অর্থনৈতিক গবেষণা ও বিতর্ক দূর অস্ত। রাজনৈতিক দলগুলি এই বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক বিলটিকে রাজনীতির চশমা দিয়ে দেখছে। ভোটের স্বার্থে হতে চলা রাজনৈতিক জোটের সম্ভাব্য সমীকরণকে মাথায় রেখে কেউ এই বিলটিকে সমর্থন কেউ বা বিরোধিতা করছে। ফলে বিলটির পক্ষে ও বিপক্ষে অর্থনৈতিক যুক্তি সাজিয়ে বিলটির প্রয়োজনীয় বিচার ও বিশ্লেষণের কাজটিই থাকছে অধরা। এর পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর। নিয়মিত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের দ্বারা ঋদ্ধ হয়ে যে বিল দেশের অর্থনৈতিক নবযুগের পথপ্রদর্শক হতে পারতো, রাজনৈতিক পঙ্কিলতার আবর্তে পড়ে সেই বিল-ই দেশের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করতে পারে। ▮

সপ্তম শতাব্দীর ধর্মীয় বর্বরতা ও কট্টরপন্থা একবিংশ শতাব্দীর মানুষ বরদাস্ত করবেন না

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায়

২০০৩ খৃস্টাব্দে ইঙ্গো-মার্কিন সৈন্যবাহিনী ইরাক আক্রমণ করে অধিকার করে নেয়। দোষ দিয়েছিল সাদ্দাম হোসেন পরমাণু অস্ত্র এবং কেমিক্যাল অস্ত্র নির্মাণ করেছেন। সাদ্দামকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কঠোর একনায়ক সাদ্দাম হোসেনের রাজত্বকালে ইরাকে কোনো অশান্তি ছিল না। জানা যায় বিশ্বের খনিজ তৈলের ৪৩ শতাংশ ইরাকের বালির নীচে চাপা রয়েছে। পরমাণু অস্ত্র অথবা কেমিক্যাল অস্ত্র অথবা বিশাল তৈল ভাণ্ডার, কিসের টানে ইরাক আক্রান্ত হয়েছিল ইতিহাসই বলবে। প্রায় আট বছর পর মার্কিন সৈন্যবাহিনী ইরাক ছেড়ে চলে যায়। ফিরে যাওয়ার আগে তারা ইরাকে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে নূরি আল মালিকীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসিয়ে দেন। ইরাকের সৈন্যবাহিনীকেও প্রশিক্ষণ দিয়ে তারা ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু মার্কিন শাসনকালে এবং তার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ইসলামিক গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। সাধারণভাবে ইরাকের উত্তরে বসতি করে কুর্দ জনগোষ্ঠী। সুন্নি সম্প্রদায়ের হলেও তারা নিজেদের আলাদা ভাবে। কারণ তারাই আরবিক অর্থাৎ ভূমিপুত্র। ইরাকের ১৭ শতাংশ খনিজ তেল তাদের অধিকারে। মধ্য ইরাকে সুন্নি সম্প্রদায়ের এবং দক্ষিণ ইরাকে সিয়া সম্প্রদায়ের বসতি। ইরাক সরকারে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব থাকায় সাদ্দাম আমলের বহু আধিকারিক ও সামরিক বাহিনীর অভিজ্ঞ জেনারেলদের সরিয়ে দেওয়া হয়।

সিরিয়ার পরিবেশ আরও ঘোরালো। মাত্র ২০ শতাংশ শিয়া সম্প্রদায়ের সমর্থন নিয়ে বাসার আল আসাদ ক্ষমতায় এসে ৭৫ শতাংশ সুন্নি সম্প্রদায়ের উপর রাজত্ব করছেন। ফলে বহু সুন্নি জেহাদি- গোষ্ঠী সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিরোধ করে চলেছে। স্থানীয় সুন্নি ইসলামিক রাষ্ট্রগুলি ওই সন্ত্রাসবাদী বিরোধীদের অস্ত্র-উপকরণ যোগাচ্ছে। মার্কিন সরকার আসাদকে ক্ষমতা ত্যাগ করে নির্বাচনে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু আসাদ ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ। তিনি কঠোর হস্তে বিদ্রোহীদের দমন করছেন। সিরিয়ার অনেকটা ভূখণ্ডই বিদ্রোহীদের হাতে ও সেখানে আসাদের আদেশ চলে না।

সিরিয়ার এই বিদ্রোহীরা স্থির করল, তারা ইরাক ও সিরিয়ার ভূখণ্ডে ইসলামিক

আই সিস ঘাঁটিতে আঘাত হানার প্রস্তুতি ফ্রান্সের ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের।

> মধ্যপ্রাচ্যের এই নিষ্ঠুর ধর্মীয় কট্টরবাদীদের শুধুমাত্র অস্ত্র-উপকরণ, বিমান আক্রমণ ইত্যাদি দিয়ে নির্মূল করা যাবে না। বহু সংখ্যায় পদাতিক সৈন্য সিরিয়া-ইরাকে পাঠিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে অধিকৃত জমি কেড়ে নিতে হবে। তবেই এই সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব হবে।

সাম্রাজ্য স্থাপন করবে, যার নাম দেওয়া হবে 'ইসলামিক স্টেট অব ইরাক'। চরম কট্টরবাদীতার বিরুদ্ধে কোনো শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না। রক্তগঙ্গা বইবে। দাসত্ব, পাথর ছুঁড়ে মৃত্যুদণ্ড, মাথা কেটে নিয়ে মৃত্যুদণ্ড এবং অতি সাধারণ অপরাধে হাত, পা কেটে নেওয়া, অর্থাৎ চূড়ান্ত বর্বরতা এবং জঘন্য সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে বশ্যতা মান্যতা আদায়। এই জঘন্য বর্বরতা আল কায়েদাকেও স্তব্ধ করে দিয়েছে। সিরিয়ার বিদ্রোহীরা ইরাকে হানা দিয়েছে। ইরাকের বিরুদ্ধবাদীরাও তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ইরাককে তারা তিনভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে সম্প্রদায়গত ভাবে— শিয়া, সুন্নি ও কুর্দ। ইরানও মধ্যপ্রাচ্যের এই লড়াইতে জড়িয়ে পড়েছে। তারা ইরাকের শিয়া এবং সিরিয়া সরকারকে সাহায্য করছে। 'ইরাক-সিরিয়া সাম্রাজ্য' সৌদি আরবকে এই সাম্রাজ্যে মাথা গলাতে দিচ্ছে না। এই সাম্রাজ্যে রাজার কোনো জায়গা নেই। খলিফাই প্রধান। এরা মনে করে সৌদি আরব লোক দেখানো ইসলাম ধর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। কট্টরপন্থী সুন্নি ইসলামের নীতি এই রাষ্ট্র কঠোর ভাবে মেনে চলে না। সৌদি আরব আবার বিশ্ববাসীকে জানাচ্ছে সিরিয়ার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তারা নিজেরাই মিটিয়ে নেবে। অন্য কোনো রাষ্ট্রের এই ব্যাপারে নাক গলানোর প্রয়োজন নেই।

সৌদি আরবে সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে মহিলারা শুধুমাত্র ভোটই দিচ্ছেন না, অনেক মহিলা প্রার্থীও হয়েছেন। ফলে সৌদি আরব এখন ব্রাত্য।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধর্মীয় কট্টরপন্থী মানুষ সিরিয়া-ইরাকে পাড়ি দিচ্ছে এই সাম্রাজ্য গঠনের যুদ্ধে অংশীদার হওয়ার জন্য। পশ্চিমী রাষ্ট্রের বহু কট্টরপন্থী সুন্নিরা অর্থ আয়ের জন্যও সিরিয়ায় যাচ্ছে। তাদের অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত-শিক্ষিতা। ইরাক-সিরিয়া সাম্রাজ্য বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রকে সাবধান করে দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে প্রত্যেক রাষ্ট্রে এমন কঠোর সন্ত্রাস ঘটানো হবে যে সর্বত্র শুধু মৃতদেহ এবং হাহাকার উঠবে।

মিশরের কাছে রাশিয়ার নাগরিক বিমান ভেঙে পড়ে আর তুরস্ক রাশিয়ার এস ইউ ২৪ যুদ্ধবিমান রকেট মেরে ধ্বংস করে। রাশিয়া সিরিয়াকে অস্ত্র সরবরাহ করছে এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। একযোগে আটটি যুদ্ধবিমান পাঠিয়ে সিরিয়ার বিদ্রোহীদের ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করেছে।

ইরাক-সিরিয়া সাম্রাজ্য অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের জাল বিস্তার করেছে। তারা সামাজিক যোগাযোগের সাধন (সোশ্যাল মিডিয়া) ব্যবহার করে তাদের সুপ্তসেল বা মডিউল গুলিকে নির্দেশ পাঠাতে সক্ষম হচ্ছে। বিশেষ করে যারা বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে সিরিয়া-ইরাকে কিছুদিন কাজ করে দেশে ফিরছে তাদের কাছে পাসপোর্ট রয়েছে, ভিসার কোনো প্রয়োজন নেই। সেই কারণে তাদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা কঠিন হয়ে গিয়েছে। তাদের ধমক অনুযায়ী লন্ডন, প্যারিস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি উন্নত রাষ্ট্রে তারা আত্মঘাতী সন্ত্রাসবাদী ব্যবহার করে বহু সংখ্যায় নিরপরাধ নরনারী ও শিশু হত্যা করেছে। বিশেষ করে প্যারিসে আটজন সন্ত্রাসবাদীর একটা দল একসঙ্গে তিনটি রেঁস্তোরা, একটা পানশালা, একটি নাট্যমঞ্চ ও খেলা চলাকালীন একটি স্টেডিয়ামে আঘাত করে অন্তত ১২৯ জনকে হত্যা এবং ৩০০ জনেরও বেশি নরনারীকে আহত করতে সক্ষম হয়েছে। তারা সিরিয়া থেকে জানিয়েছে এটাতো শুধুমাত্র প্রারম্ভিক ঝড়! এরপর সর্বত্র আরও বড় আঘাত আসবে।

সমগ্র বিশ্ব প্যারিসের এই সন্ত্রাসের ঘটনার নিন্দা করেছে। ফরাসী প্রেসিডেন্ট হল্যান্ডে ইরাক-সিরিয়া সাম্রাজ্যের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট এই উগ্র কট্টরপন্থী শক্তিকে উৎখাত করবার কথা ঘোষণা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীও শক্তি প্রয়োগ করার প্রতিজ্ঞা করেছেন।

রাষ্ট্রপতি ওবামা সিরিয়ার আসাদ সরকারের পরিবর্তন চাইলেও রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিন আসাদকে সমর্থন করেছেন। বরং তিনি তাঁর বিরোধীদের নিরস্ত করার প্রয়াস করছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন, 'ফ্রান্সে এই সন্ত্রাস, মানবিকতার উপর আঘাত।' তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘকে আবার আবেদন করেছেন, সন্ত্রাসের সংজ্ঞা কী রাষ্ট্রসঙ্ঘই ঠিক করুক, যাতে বিশ্বের মানুষ জানতে পারেন কে বা কারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। তিনি আরও দাবি করেছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধীনে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী শক্তি 'সংগঠিত করে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করতে হবে।

জি-২০ রাষ্ট্র সংগঠনের রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান পুতিন কটাক্ষ করে বলেন, অনেক রাষ্ট্রই লুকিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সন্ত্রাসবাদীদের থেকে খনিজ তেল কিনছে। সেই অর্থ ব্যবহার করে তথাকথিত ইরাক-সিরিয়া সাম্রাজ্য অস্ত্র-উপকরণ ক্রয় করে বিশ্বে সন্ত্রাস পরিচালনা করছে।

পূর্ব সিরিয়ায় 'ক্যালিফেট'-এর প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে দুর্বার বেগে অগ্রসর হয়ে তারা বাগদাদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান ও রাশিয়ার সংযুক্ত বায়ুসেনা, ড্রোন ইত্যাদি যুদ্ধে যোগদান করায় বাগদাদ এবং সিরিয়ার রাজধানী এখনও 'ইরাক-সিরিয়ার সাম্রাজ্য' গ্রাস করতে পারেনি। ইরাকের আবুবাকর বাগদাদি নিজেকে সাম্রাজ্যের খলিফা হিসাবে জাহির করেছেন। তাঁর নাম হয়েছে 'অদৃশ্য শেখ'। এমন কোনো জঘন্য, বর্বর ও নিষ্ঠুরতা নেই, যা এই বাগদাদি করতে না পারে। মার্কিন সৈন্যবাহিনী ২০০৬-এ বাগদাদিকে গ্রেপ্তার করেছিল এবং ২০০৯-এ তাকে মুক্ত করে দেয়। বর্তমান বিশ্বে সে এখন সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সন্ত্রাসবাদী। আলকায়েদার নেতাকেও সে

অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে। অন্তত ৩০ হাজার স্থানীয় মানুষ তার নির্দেশে নিহত হয়েছে। সে সম্প্রতি ইরাকের মসুল শহরকে কালিফাত-এর রাজধানী বলে ঘোষণা করেছে। সিরিয়ার সীমান্ত শহর বৌকামল থেকে প্রাদেশিক রাজধানী ডের এল জৌর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল এখন বাগদাদির অধীন। ইরাকের মসুল ও টিকরিত তারা আগেই অধিকার করেছিল। আলকায়েদার যে দলটি নুসরা ফ্রন্ট নামে পরিচিত তারা ইরাক-সিরিয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, তাদের অনেকেই বাগদাদির সন্ত্রাসবাদী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ফলে সিরিয়ার সবচেয়ে বড় খনিজ তেল উত্তোলন সংস্থা আল ওমারও বাগদাদির হাতে চলে গিয়েছে। এটা সহজেই অনুমেয় যদি বাগদাদ অধিকারের যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহলে অগণিত মানুষ হতাহত হবেন। সম্পত্তির ক্ষতি হবে অপরিসীম। শিয়া, সুন্নি ও কুর্দদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যাবে।

আবুবাকর বাগদাদি তাঁর বিগত রমজান ভাষণে খালিফাত-এর সমর্থনে বিশ্বব্যাপী জিহাদের ঘোষণা করেছে। বিশেষ করে উপসাগরীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহ পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি, দক্ষিণ এশিয়াকে নাম করে এবং সুন্নি মুসলমান সম্প্রদায়কে এই ইসলামিক সাম্রাজ্যকে সমর্থনের জন্য বলেছেন। এর ফলে কট্টরপন্থী সুন্নি সম্প্রদায়ের হাজার হাজার তরুণ-তরুণী যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইন্দোনেসিয়া, সিঙ্গাপুর থেকে ইরাক-সিরিয়ায় পাড়ি দিয়েছে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকেও বহু মানুষ সেখানে গিয়েছে।

প্রতিটি রাষ্ট্রই বিমানবন্দর, নৌ-বন্দর এবং দেশের মধ্যে সুরক্ষা ব্যবস্থা কঠোর করেছে। তা সত্ত্বেও ফ্রান্সে এবং খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেহাদি সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে গেল। অন্য বহু রাষ্ট্র এখন সন্ত্রাসের প্রহর গুনছে। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন শহর এই সন্ত্রাসের তালিকায় রয়েছে বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবর। সিমি ও ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনদের উপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কয়েকজন সামরিক পরামর্শদাতাকে ইরাকে পাঠিয়েছেন। বর্তমানে তারা কিছু সংখ্যক পদাতিক সৈন্য পাঠাবার চিন্তা করছে। প্যারিসের সন্ত্রাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বুঝিয়ে দিয়েছে ২৬/১১ মুম্বই হামলা কত বড় ঘটনা ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর একটা ৯/১১ ঘটা অসম্ভব নয়। তারা জানিয়েছে, ২৬/১১-র অপরাধীদের দ্রুত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা তাঁরা করবে। আর একটা বিষয় পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে বুঝতে হবে, মধ্যপ্রাচ্যের এই নিষ্ঠুর ধর্মীয় কট্টরবাদীদের শুধুমাত্র অস্ত্র-উপকরণ, বিমান আক্রমণ ইত্যাদি দিয়ে নির্মূল করা যাবে না। বহু সংখ্যায় পদাতিক সৈন্য সিরিয়া-ইরাকে পাঠিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে অধিকৃত জমি কেড়ে নিতে হবে। তবেই এই সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব হবে।

এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তি হিসাবে প্রচণ্ড সন্ত্রাসের খাঁড়া নেবে আসবে। তবে তার জন্য ভয় পেলে চলবে না। ইরাক-সিরিয়া সাম্রাজ্যের (আই এস আই এস) ভিত্তিতে যখন প্রচণ্ড আঘাত পড়বে তখন বিশ্বের অন্যত্র সন্ত্রাস ঘটানোর ক্ষমতাও তাদের লোপ পাবে।

মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধকালীন অবস্থা ভারতের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত খনিজ তেলের জন্য মধ্যপ্রাচ্য এবং ইরানের উপর নির্ভরশীল। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যেও এই যুদ্ধের প্রভাব পড়ছে। বহু ভারতীয় ওই সমস্ত রাষ্ট্রে চাকরি করে অর্থ উপার্জন করেন। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই বহু তেমন মানুষকে দেশে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছে। অবস্থা আরও খারাপ হতে পারত। এখনও বহু ভারতীয়কে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাচীন অ্যাসিরিয় সভ্যতার নিদর্শন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে আই সিস জঙ্গি।

একদিকে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র একত্র হয়ে পৃথিবীতে মানব প্রজাতিকে রক্ষা করার প্রয়াস করছে, যেমন পরিবেশ দূষণ থেকে বিশ্ববাসীকে বাঁচাতে বন্ধুত্বপূর্ণ দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন ধারণের মান উন্নত করার প্রয়াস চলছে। অন্যদিকে এ কেমন প্রয়াস! সপ্তম শতাব্দীর চরম ধর্মীয় মৌলবাদকে পুনরায় একবিংশ শতাব্দীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা! মানবিকতার বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত!

আমার বিশ্বাস, আজও যাঁরা ধর্মীয় কট্টরপন্থী, বিশ্বের নরমপন্থী সহানুভূতিশীল মানুষ তাদের বরদাস্ত করবেন না। বিশ্বকে কলুষমুক্ত করতে ভূমধ্যসাগরে তাদের বিসর্জন দেবেন। ■

আমরা কি এক অঘোষিত যুদ্ধে সামিল হতে চলেছি?

অভিমন্যু গুহ

প্যারিসে বর্বরোচিত সন্ত্রাসবাদী হানার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন। তিনি লন্ডনের মানুষ ঠাসা ওই স্টেডিয়ামে বলেছিলেন যে সন্ত্রাসের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উচিত সর্বাঙ্গীণ সম্মেলনের আয়োজন করা। পরবর্তীকালে ভারত সচিব-পর্যায়েও এই বিষয়টি রাষ্ট্রসঙ্ঘের কানে তুলেছে। ২০০৮-এর নভেম্বরে মুম্বাইয়ে যে পাশবিক হামলা চলেছিল সেটির সঙ্গে তাৎক্ষণিক তুলনীয় ছিল ২০০১-এ ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগনে সন্ত্রাসবাদী হামলা। কিন্তু ২০০১ থেকে ২০০৮ —এই সাত বছরে সন্ত্রাসের চরিত্রে একটা বড়োসড় পরিবর্তন হয়েছিল এবং ২০০৮ থেকে ২০১৫ —এই পরবর্তী সাত বছরে যে পরিবর্তিত চরিত্রের কালানুক্রমিক প্রতিফলন আমরা দেখতে পেলাম। একইসঙ্গে এটাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল পৃথিবীর ছোটো, বড়ো, মেজো— কোনো শহরই আর এই মুহূর্তে নিরাপদ নয়। সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসবাদীদের কোনো ধর্ম হয় না বলে যাঁরা গলা ফাটান, তাতে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি এঁদের সহানুভূতির প্রতিফলন ঘটতে পারে। কিন্তু সমস্যার সমাধান এভাবে হয় না। কারণ সন্ত্রাসের মোকাবিলায় কোনো স্পর্শকাতর বিষয়কে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। ভুক্তভোগী দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার।

পৃথিবীর সব মুসলমান সন্ত্রাসবাদী— এমন নির্বোধের মতো দাবি কেউ কোনোদিন করেননি। ভবিষ্যতেও করবেন না। কিন্তু ইসলামিক সন্ত্রাসবাদকে এই তত্ত্ব দিয়ে অস্বীকার করার অর্থ প্রকারান্তরে সন্ত্রাসবাদকেই উৎসাহিত করা। ২০০১-এর হামলাটিকে আমেরিকার প্রতি ওসামা বিন লাদেনের ব্যক্তিগত রোষ ইত্যাদি বলে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারতো। কিন্তু ২০০৮-এর মুম্বই হামলা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল বিশ্বজুড়ে ইসলামিক রাষ্ট্র

একজনরে

আই এস-এর উত্থান

- উৎস : ১৯৯৯-এ প্রতিষ্ঠা। ২০০৪-এ আল কায়েদা থেকে আলাদা হওয়া। জুন, ২০১৪-এ 'খিলাফত' (CALIPHATE) হিসেবে ঘোষণা।
- অধিকৃত এলাকা : ২৪৩,০০০ বর্গকিলোমিটার (গ্রেটবৃটেন-এর মতো)।
- জনসংখ্যা : ৬০ লক্ষ (৬ মিলিয়ন)।
- জেহাদি : ২০,০০০ (আনুমানিক)।
- অস্ত্রশস্ত্র : বিএনপি-২, ১৫৫ হাউইৎজার, হানভিস, ২৩ এম এম অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান, স্টিনজার ম্যানপ্যাডস (Manpads), টি-৫৫, টি-৬২ মেন ব্যাটেন ট্যাঙ্ক।
- বিদেশি জেহাদিদের সংখ্যা : ১০,০০০ (আনুমানিক)
- আয় : প্রতিদিন ৩ মিলিয়ন ডলার (১৮০ কোটি টাকা)। বেশিরভাগ আয়ই তেল বিক্রি করে।
- নিয়ন্ত্রিত বা অধিকারভুক্ত এলাকা : সিরিয়া ও ইরাক।
- গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ :
- ২০ মার্চ, ২০১৫— ইয়েমেন-এর সানা-তে। আত্মঘাতী চার জঙ্গি হামলায় ১৪২ জন নিহত।
- ১০ অক্টোবর, ২০১৫— ইস্তাম্বুল-এ। একটি শান্তি মিছিলের উপর আক্রমণ। ১০২ জন নিহত।
- ৩১ অক্টোবর, ২০১৫— একটি রুশ বিমানকে বোমা নিক্ষেপ করে ধ্বংস। ২২৪ জন নিহত।
- ১২ নভেম্বর, ২০১৫— আত্মঘাতী হামলায় ৪৩ জন নিহত।
- ১৩ নভেম্বর, ২০১৫— প্যারিসে ৮ জন আত্মঘাতী আই এস জেহাদির সংগঠিত আগমনে ১৩৯ জন নিহত।

সিরিয়ায় আই সিস ঘাঁটিতে ফ্রান্সের বোমারু বিমানের বোমাবর্ষণ।

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক চক্র পাকিস্তান-সহ বিভিন্ন ইসলামীয় দেশের মদতে কতদূর সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। আর সাম্প্রতিক প্যারিস হামলা একপ্রকার ঘোষণাই করে দিল বিশ্ব এখন দু'ভাগ। এক পক্ষে রয়েছেন বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ, অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদীরা। সুতরাং মানবতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক অঘোষিত বিশ্বযুদ্ধে সামিল হতে চলেছি আমরা।

অবশ্যই এই বিশ্বযুদ্ধে শান্তিকামী মানুষের সবচেয়ে বড়ো প্রতিপক্ষ আই এস। এবং এখনও পর্যন্ত বিশ্ব এ জাতীয় বৃহত্তম কোনো সন্ত্রাসবাদী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছে কিনা সন্দেহ। সত্যি কথা বলতে কী আল কায়দা, লস্কর-এ-তৈবা কিংবা বোকো হারামের মতো জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে এদের তুলনা করা চলে না। কারণ এদের প্রভাব আঞ্চলিক স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। বড়ো জোর জঙ্গি র‍্যাকেটের মাধ্যমে বৈশ্বিক স্তরে প্রভাব জারির প্রয়াস ছিল। কিন্তু তাতে সমস্যাও ছিল। বিশেষ করে পারস্পরিক সমঝোতার। ফলে এদের মোকাবিলা করা বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে তুলনায় সহজতর ছিল। কিন্তু আই এসের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনেক ঘোরালো। অথচ এই শতাব্দীর গোড়ায় ইসলামিক স্টেট অব্ ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া (আই এস আই এস) ভালোভাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন এদের প্রভাব ওই দুই দেশেই হয়তো ছিল। কিন্তু ২০১৩-র গোড়ায় আই এস আই এস দখল নিল সিরিয়ার বিশাল একটা অংশের। প্রকারান্তরে একটি দেশের দখল নিয়ে গোটা বিশ্বের ত্রাস হয়ে ওঠার সেই শুরু এই জঙ্গি সংগঠনটির। সাম্প্রতিকতম প্যারিস-হামলার পরে তা আরও স্পষ্ট। আর সেই সঙ্গে ইরাক ও সিরিয়ার ইসলামিক স্টেট এখন কেবলই ইসলামিক স্টেট (আই এস)-এ পরিণত হয়েছে। তাই শুধু ইরাক, সিরিয়া নয়, গোটা বিশ্বেই ইসলামিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এদের লক্ষ্য। ইতিপূর্বে যেসব জঙ্গি-সংগঠনগুলির নামোল্লেখ করা হয়েছে তাদের এই লক্ষ্য থাকলেও, সাধ আর সাধ্যে বিস্তর তফাত ছিল। আই এসের হিটলিস্টে ভারতের স্থান কিছুটা পেছনের দিকে থাকলেও অচিরেই এদেশের ওপর তাদের হানাদারি নেমে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন গোয়েন্দারা। স্রেফ পরলোকের লোভ দেখিয়েই যে কাজ হাসিল করা যাবে না আই এস সেটা বুঝেছে বোধহয়। তাই তাদের জঙ্গিদের মাসিক বেতন ২০০ ডলার থেকে ৬০০ ডলারের মধ্যে। জঙ্গি সংখ্যাও নেহাত কম নয়। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ-র ২০১৪-র সেপ্টেম্বরের প্রতিবেদন অনুযায়ী এদের জঙ্গি সংখ্যা ২০ হাজার থেকে ৩১ হাজার ৫ শো-র মধ্যে। সব মিলিয়ে বেতন ইত্যাদি খাতে প্রায় ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করছে আই এস। তালিবানি আফগানিস্থানের চরিত্রের সঙ্গে এই আই এসের চরিত্রগত ফারাক তো ছিলই। সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রশাসনিক কৌশলেও আই এসের

মুম্বই ২৬/১১ বনাম প্যারিস ১৩/১১

মিল

উৎস :	লস্কর- এ- তৈবার পাকিস্তানি জঙ্গিরা অনুপ্রবেশ করেছিল। জলপথে ও স্থলপথে।	বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও সিরিয়ার জঙ্গিরা একই কায়দায় প্যারিসে হামলা চালায়।
লক্ষ্য :	সহজ লক্ষ্যবস্তু, নিরাপত্তা কম এমন কিছু জায়গাকে বেছে নেওয়া।	জনাকীর্ণ ছ'টি পৃথক নিরাপত্তা-হীন লক্ষ্যবস্তুর ওপর হামলা।
এলাকা :	ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানীর ৩ বর্গ-কিলোমিটারের মধ্যে ছিল সব লক্ষ্যবস্তুগুলি।	সাতটি লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ছ'টি ছিল প্যারিসের ৩.৬ বর্গকিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে।

গরমিল

হামলা :	অবরোধ চলেছিল প্রায় ৬০ ঘণ্টা। দিল্লী থেকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড আসার অপেক্ষায় ছিল পুলিশ।	আক্রমণ চলেছে তিন ঘণ্টারও কম সময়ে। মধ্য-রাতেই ফরাসি প্রেসিডেন্ট-এর কাছ থেকে নির্দেশ আসে জঙ্গিদের উড়িয়ে দেওয়ার।
সংবাদমাধ্যম :	তাজমহল হোটেলে পণবন্দি অভ্যাগতদের বিপন্ন জীবনের সর্বক্ষণ মিডিয়া কভারেজ।	আক্রমণের অব্যবহিত পরেই সংবাদমাধ্যমের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

মতো এতটা দক্ষ ছিল না লাদেনের আল কায়দা।

কিন্তু যে সিরিয়া আই এসের ঘোষিত রাজধানী, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আন্তর্জাতিক কূটনীতির বেড়াজালে পড়ে গিয়েছে এই দেশটি। সিরিয়ার বর্তমান প্রশাসনকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না আমেরিকা। আবার রাশিয়া রয়েছে এদের পাশে। তাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক যুদ্ধেও যেভাবে দলাদলির সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে এর কার্যকারিতা অনেকাংশে আশঙ্কার সৃষ্টি করছে। এখন গুরুতর প্রশ্ন, আই এসের মোকাবিলা কীভাবে করা যাবে? প্রথমেই বলে রাখা দরকার, ২০১৪-র গ্রীষ্ম থেকে এ-পর্যন্ত আই এসের ভাগ্যে কিছু জয় জুটেছে। যেমন তারা এই বছরের গোড়ায় রামাদি ও পালমিরার মতো শহরের ওপর তাদের দখল কায়েম করতে পেরেছে। অন্যদিকে গত দেড় বছরে তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও কম কিছু নয়। যেমন দু'দুটো ইরাকি শহর বেইজি ও তিকরিত তাদের হাতছাড়া হয়েছে। সিরিয়ার সীমান্তবর্তী শহর কোবেনে আই এসের হাজার পাঁচেক সদস্য মারা গিয়েছে। এখন সিনজারেও তাদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হচ্ছে। সুতরাং আই এসের বিপদ-সংকেতের মধ্যে এটাও স্পষ্ট যে পাল্টা আক্রমণে তারাও পিছু হটতে বাধ্য। এই সুযোগটা এই মুহূর্তেই গোটা বিশ্বের একজোট হয়ে নেওয়া দরকার বলে মনে করছেন সমর-বিশেষজ্ঞরা।

এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিটাও বিচার করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভারতে প্রায় ১৭.২ কোটি মুসলমান বাস করেন। ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তান বাদে এই বিপুল মুসলমান জনসংখ্যা পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। আরব দুনিয়ার মুসলমানদের সঙ্গে এদেশের মুসলমানদের এক করে ফেলার প্রবণতা ঐতিহাসিকভাবে ভুল। এবং এদেশের একশ্রেণীর রাজনীতিবিদদের সেই ভুলের মাসুল এখন আমাদের দেশকে দিতে হচ্ছে। ফ্রান্সের ৬.৬ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৮ শতাংশ মুসলমান। প্যারিস হামলার পর থেকেই এদের সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। এই ৮ শতাংশ মুসলমান সবাই সন্ত্রাসবাদী— এমন মন্তব্য কেউ করছেন না। তবে এদের মধ্যেই সন্ত্রাসবাদীরা লুকিয়ে থাকতে পারেন— ফ্রান্সবাসী এমনটাই মনে করছেন। অন্যদিকে, ভারতের প্রকৃত নাগরিক মুসলমানদের নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু অনুপ্রবেশ-জনিত ও অন্যান্য কারণে যে মুসলমানরা শতছিদ্র সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছে, তারা শুধু এদেশের অর্থনীতিকেই বিপন্ন করছে না, দেশের নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষাকেও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। একইসঙ্গে এদেশের মুসলমানদেরও প্রভাবিত করছে দেশবিরোধী কাজে।

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাক গোয়েন্দা বাহিনী আই এস আইয়ের এজেন্টদের ধরা পড়ার ঘটনা এরই প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে। এদের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগও আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। ফলে ভারত যে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ফুটন্ত কড়াইয়ের মধ্যে অবস্থান করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী মণিশঙ্কর আইয়ার কিছুদিন আগেই ফ্রান্স-প্রশাসনকে জ্ঞান দিয়েছিলেন সেদেশের মুসলমানদের রক্ষার জন্য। তাঁর এই অযাচিত জ্ঞান-দান ফরাসি মুসলমানদের প্রতি উথলে ওঠা দরদ থেকে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং এর মধ্যে কংগ্রেসী সংকীর্ণ রাজনীতিই ফুটে উঠেছে আর তাতে ভারতবর্ষের নিরাপত্তা বারংবার বিঘ্নিত হয়েছে। এমনটা ভাবা নিতান্ত মুর্খামি যে এর মধ্যে দিয়ে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছড়ানোর কথা বলা হচ্ছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সহাবস্থান যেখানে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সেখানে দেশের সাধারণ মুসলমান নাগরিকের প্রতি অসম্মানের কোনো স্থান থাকতে পারে না। কিন্তু যে মুসলমানরা দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনীতিকে বিপন্ন করার জন্য ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে, তাদের প্রতি সেই একই সহনশীলতা দেখানো কতটা জরুরি? সুতরাং দেশের বর্তমান প্রশাসনকে প্রয়োজন কঠোর হতেই হবে; রাজনৈতিক ও একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী সংবাদমাধ্যমের চাপ উপেক্ষা করেই। নতুবা আই এসের হাত থেকে ভারতবর্ষকে বাঁচানো কঠিন হবে।

আই সি এস আর (ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব্ র‍্যাডিক্যালাইজেশন অ্যান্ড পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স)-এর প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, ১৫০০ ফরাসি নাগরিক, ১২০০ রুশ নাগরিক, ৬০০ বৃটিশ ও জার্মান নাগরিক আই এসে যোগদান করেছে। আই এসের ভারতীয় রিক্রুট এখনও তেমন মাথাব্যথার পর্যায়ে না গেলেও অদূর-ভবিষ্যতে তার সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গত কারণেই ভারতের প্রাক্তন বিদেশ-সচিব কানওয়াল সিবাল লিখেছেন এই লড়াই সহজ নয়। আর সহজ নয় বলেই আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহল মনে করছেন সারা বিশ্বকে এই লড়াইয়ে সামিল হতে হবে একযোগে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের নেতৃত্বে আই এসের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। আর এটা করতে গেলে কূটনৈতিক যে কোনো স্পর্শকাতরতাকে জলাঞ্জলি দেওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে অভিমত বিশেষজ্ঞদের। ■

চিঠিপত্র

ন্যাশন্যাল হেরাল্ড পত্রিকা ও গান্ধী পরিবার

১৯৩৮ সালে অ্যাসোসিয়েটেড জার্নাল লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই কোম্পানি ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকা প্রকাশ করে যা কংগ্রেসের মুখপত্র হিসাবে কাজ করত। ১৯৫৬ সালে এই পত্রিকা ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ২৫ অনুসারে অ-লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রেজিস্ট্রেশন করে। ২০০৯ সালে ইয়ং ইন্ডিয়া ৫ লক্ষ টাকা পেড-আপ ক্যাপিটালে এ জে এল-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। ইয়ং ইন্ডিয়ার ৭৬ শতাংশ শেয়ার সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীর। কংগ্রেস পার্টির এই সঙ্কট মোচনে ৯০ কোটি বাণিজ্যিক কোম্পানিকে ধার দেওয়াটা আইন বিরুদ্ধ কাজ বলে বিবেচিত হয়। কেননা রাজনৈতিক দল কিছুটা আয়কর ছাড় পায় দল হিসাবে। ইয়ং ইন্ডিয়া ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ধার শোধ করার দায়িত্ব নেয়। পরিবর্তে এ জে এল-এর বেশির ভাগ শেয়ার নিয়ে নেয় এবং এ জে এল গৌণ শেয়ার হোল্ডার হয়ে যায়। ২০০০ কোটি টাকার সম্পত্তির ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে খবরদারি করার অধিকার পায় ইয়ং ইন্ডিয়া, যার ফলে সোনিয়া ও রাহুল গান্ধী সম্পত্তি আত্মসাৎ করার দায়ে অভিযুক্ত হয়। সুব্রহ্মনিয়াম স্বামীর আবেদনের ফলে দিল্লী হাইকোর্ট প্রাথমিকভাবে কোর্টে হাজির হতে বলছে এবং মনে করেছে অর্থনৈতিক নীতি বিরুদ্ধ কাজ করেছে।

এই ঘটনা নিয়ে কংগ্রেস বিক্ষোভ শুরু করে দিয়েছে এবং সংসদ অচল করছে। অভিযোগ নরেন্দ্র মোদী সরকার প্রতিহিংসামূলক কাজ করছে। ব্যাপারটা আদালতের, এক্ষেত্রে রাজনীতির কী সম্পর্ক আছে? নিন্দুকেরা মোদীজীকে যতই সমালোচনা করুক না কেন এই ১৮ মাসে দুর্নীতি বহুলাংশে বন্ধ হয়েছে। এটা বোধহয় অনেকের সহ্য হচ্ছে না। টাকা চুরি করবে, দেশের সম্পত্তি নষ্ট করবে কিছু বলা চলবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেছিলাম মদন মিত্রকে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে। বিচিত্র এই দেশ! আমেরিকায় সামান্য টেপ কেলেঙ্কারির জন্য মহা শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। গণতন্ত্র ওদের মুখেই সাজে।

—কমল মুখার্জী,
চুঁচুড়া, হুগলী।

সত্যের জয়

সারদা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা মদন মিত্রের হাইকোর্টে জামিন বাতিলের ঘটনায় প্রমাণিত হলো আইন আইনের পথেই চলে। অথচ নিম্ন আদালতে জামিন মঞ্জুর হওয়া মাত্র তিনি বা তৃণমূল নেতৃত্ব সত্যের জয় হলো বলে মন্তব্য করেছিলেন। তৃণমূল নেতৃত্বও এই রায়ে উল্লসিত হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্টে যে এই মন্তব্য ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে তা মনে হয় প্রথমে তৃণমূল নেতৃত্ব বা স্বয়ং মদন মিত্রও বুঝতে পারেননি। যখন বুঝতে পারলেন তখন মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করলেন এবং তৃণমূল নেত্রী তথা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তা গ্রহণও করলেন। অথচ এর আগে গ্রেপ্তার হওয়ার পর পদত্যাগ করলেও মুখ্যমন্ত্রী তা গ্রহণ করেননি। কিন্তু একজন অপরাধীর দীর্ঘদিন জেলে বন্দি অবস্থাতেও মন্ত্রিত্ব বজায় রাখা নিশ্চয়ই শোভনীয় নয়। যেখানে কোনো অভিযুক্ত অপরাধীর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়াই আইনবিরোধী কাজ, সেখানে কীভাবে একজন জনপ্রতিনিধি দীর্ঘদিন মন্ত্রিত্ব বজায় রাখলেন তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। আর অসুস্থতার ভান করে দীর্ঘদিন সরকারি হাসপাতালে বহাল তবিয়তে থাকাটাও শোভা পায় না। আসলে তৃণমূল নেতৃত্ব মদন মিত্রকে নির্দোষ হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সারদা কাণ্ডে যে দলের পাণ্ডারা চিটফান্ডের কয়েকশো কোটি টাকা লুটেপুটে খেয়েছে সেই সত্যটিকে আর ধামাচাপা দেওয়া যাচ্ছে না। গরিব মানুষের টাকা কারা লুঠ করেছে তা মানুষের আদালতে ধরা পড়ে গেছে। তাই শাক দিয়ে যে আর মাছ ঢাকা দেওয়া যাবে না তা তৃণমূল নেতৃত্ব বুঝে গেছেন। তাই মদন মিত্রের জামিন বাতিলের ঘটনায় তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। আর মন্ত্রীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী সাধু সাজার চেষ্টা করছেন। দলের একনিষ্ঠ সৈনিককে বোঝা ভেবে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছেন। কিন্তু মদন মিত্রকে ত্যাগ করার সৎসাহস তৃণমূল নেত্রী সহজে দেখাতে পারবেন না। কারণ তাহলে মদন মিত্র অনেক গোপন তথ্য সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেবেন। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলকে অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হতে পারে। তিনি বুঝতে পারছেন যে দুধকলা দিয়ে এত সাপ পুষেছেন যা দলকে বিপাকে ফেলতে পারে। তাই সারদা ইস্যু নিয়ে আপাতত চুপ থাকাই শ্রেয়। আর মদন মিত্রের জামিনের ঘটনা অনৈতিক ছিল আদালতে তা প্রমাণ হয়ে গেছে। দলের কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতাও কমে গেছে। কিন্তু জামিন বাতিলের ঘটনায় সত্যের জয় হলো বলার সৎসাহস নেই তৃণমূল নেতৃত্বের। তবুও সাধারণ মানুষের কাছে এ ঘটনা সত্যেরই জয়।

—সমীর কুমার দাস,
দ্বারহাট্টা, হুগলী।

মোদীর সরকার ও বাংলা সংবাদপত্রের ভূমিকা

একদিন যে-বালক 'নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে' মন্ত্রে দেশসেবার অঙ্গীকার নিয়েছিল। কঠোর দারিদ্র্য এবং নানা ধরনের বিপরীত পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম করে আজ সেই 'শুভ্রপ্রাণ' 'পবিত্র' এই ভারতভূমির কর্ণধার। দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী নানা ধরনের সামাজিক ও আর্থিক কল্যাণ-সূচির সূচনা করে বিগত

দেড় বছরে ভারতের ভাবমূর্তিকে বিশ্ববাসীর সামনে অত্যুজ্জ্বল মহিমা ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জনকল্যাণের এই কর্মপ্রবাহ ফল্গুধারার ন্যায় বয়ে চলেছে। নিত্যনতুন সূচি এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত হচ্ছে। তবে সব কিছুরই ফল এখনই প্রাপ্য নয়! সময়ে তার উত্তর পাওয়া যাবে।

গণতন্ত্রের বড় কথা সরকারের কাজকর্মের বিচার-বিশ্লেষণ করা। প্রশংসা, ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়ে সরকারকে পরিচালনা করা। সেখানে কোনো আপোশ বা ক্ষমা নেই। গণতন্ত্রের এই সুযোগ্য বাহন সংবাদপত্র। তাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি গণতন্ত্রকে বলশালী করে। গণতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের এই বলিষ্ঠ ভূমিকা স্মরণ করে বর্তমানে বাংলা সংবাদপত্রে নরেন্দ্র মোদীর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা অত্যন্ত জরুরি। এখানে দেখা যাচ্ছে বাংলার প্রায় সব সংবাদপত্র প্রতিদিনই নরেন্দ্র মোদী সরকারের কাজের বিরূপ সমালোচনা করে যাচ্ছে প্রতি পদে। জনগণের রায়ে প্রতিষ্ঠিত একটি সরকারকে যতরকমে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যায়, তারই প্রতিযোগিতায় মেতেছে এইসব বাংলা সংবাদপত্র। কেউ লিখছে মার্জিত ভাষায়। কেউ অপমানের ভাষায়। নাম করে কোনো সংবাদপত্রের উল্লেখের প্রয়োজন নেই। আজ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ভারত সর্বোচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এর কোনো স্বীকৃতি বা উল্লেখ এইসব কাগজে দেখা যায় না! বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে অধুনা-লুপ্ত 'দৈনিক বসুমতী' ও 'যুগান্তর'-কে ভোলা যায় না! এই দুই পত্রিকায় তৎকালীন সরকারের কাজের সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু তার প্রকাশ ছিল কত মার্জিত! শুধু সরকার নয়; ক্ষমতাসীন দল, বিরোধীদলের কার্যকলাপ, সম্মেলনের বিবরণী লেখাও হোত অত্যন্ত সংযত ভাষায়। এই প্রসঙ্গে সেই সময়ে অনুষ্ঠিত বিলাসপুরে সবভারতীয় জনসঙ্ঘের সম্মেলন উপলক্ষে 'যুগান্তরের' সম্পাদকীয় 'বিলাসপুরের চিন্তা বিলাসীরা' আজও বারবার মনে পড়ে যায়। এক্ষেত্রেও বাংলা সংবাদপত্রের কেন্দ্রীয় শাসকদলের প্রতি মনোভাব গভীর দুঃখ ও বেদনাদায়ক।

বাংলা সংবাদপত্রের বর্তমানে শাসক ও শাসকদলের প্রতি মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীকে একটি কথায় চিহ্নিত করা যায়। তার নাম 'বিদ্বেষ'। 'বিদ্বেষ' এমন একটি ব্যাপার যা ব্যক্তি-মানুষকেও তার হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে দেয়। বৃহত্তর ক্ষেত্রেও এই ভাব দেখা যায়। তাই একই দোষে দুষ্ট অধিকাংশ বাংলা সংবাদপত্র নরেন্দ্র মোদীর কেন্দ্রীয় সরকার ও শাসকদলের দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি তির্যক দৃষ্টিতেই পর্যালোচনা করে যাচ্ছে। দেশের কল্যাণে নিবেদিত প্রকৃত অর্থেই একটি 'জাতীয়তাবাদী সরকারের' প্রতি এদের সংকীর্ণ ও বিরুদ্ধ মনোভাব আগামী দিনেও সহজে পরিবর্তন ঘটবে বলে মনে হয় না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশভক্ত নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বেড়ে গেছে। সবার সামনে দেশকল্যাণে মোদীর বার্তা, তাঁর জনমুখী কার্যকলাপের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে হবে।

—রণজিৎ সিংহ,
কলকাতা-৩৬।

অপাত্রে দান

একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এক বিতর্কিত প্রস্তাব পেশের খবর সংবাদপত্রে দেখে এই পত্রের অবতারণা। শুধু পত্রলেখকই নয়, সভায় উপস্থিত উপাচার্যও এই প্রস্তাব শুনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন।

প্রথম থেকে শুরু করা যাক, রাজ্যের দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে তৃণমূলনেত্রী তথা রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'বদলা নয় বদল চাই'। অথচ আজ ঠিক উল্টো পথে হেঁটে আগামী নির্বাচনে যাতে হিটলারি কায়দায় গুণ্ডামি করে জিততে পারেন তার ব্যবস্থা হয়েছে। চিটফান্ড, ডাকাতি, রাহাজানি, ধর্ষণ উত্তরোত্তর ঘটে চলেছে তাতে উপরোক্ত বক্তব্যই যথার্থ। এবারে তাঁর মুখনিঃসৃত ভাষার প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করছি।

(১) যুবসমাজ মদ খাবে নাতো জল খাবে? (মদের লাইসেন্স আকছার দেওয়ার পর।)

(২) 'তৃণমূল কখনও রিগিং করে না, গঙ্গাজল হাতে নিয়ে বলতে পারি।'

(৩) (দেশের প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচন প্রাক্কালে বলেছিলেন) ''কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরাবো।''

(৪) পশ্চিমবঙ্গে নামতে দিয়েছি ভাগ্য ভালো।

(৫) 'ও কোন হরিদাস পাল'?

(৬) 'চাবকে সোজা করে দেব'।

(৭) 'মেরে চামড়া গুটিয়ে দেব'।

(৮) (কেউ কিছু বললো না, অথচ উনি সংখ্যালঘু সভায় বক্তব্যের মাঝে বলেছেন) 'রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রমে গেলে তো কথা ওঠে না'।

(৯) মিঠুন আমার সঙ্গে আজ কথা বলতে ভয় পায়।

(১০) (রাজ্যে যেখানে বেকারের বিশাল সংখ্যা সেখানে তাদের উদ্দেশ্যে প্রায় উপহাস করে বলেছেন) 'ব্যবসা করুন, মুড়ি তেলেভাজার দোকান করে ব্যবসা করুন'।

এরূপ একজনকে সাম্মানিক ডি.লিট দেওয়ার প্রস্তাব করতে পারেন পূর্ব মেদিনীপুর মহিষাদল মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ উৎপল উখাসিনি সেটা ঠিক মেলাতে পারা যাচ্ছে না। নিজ পদের প্রতি অবিচার করে একজন দুর্ভাষী মহিলাকে ভাষাজ্ঞানের সর্বোচ্চ উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব করাটা নিতান্তই তৈলমর্দনের নগ্নরূপ নয় কি?' অথবা অপাত্রে দান নয় কি?

—দেবপ্রসাদ সরকার,
মেমারী, বর্ধমান।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

মা দন্তেশ্বরী

গোপালকৃষ্ণ রায়

মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী পরেও বস্তার জেলার আদিম উপজাতিদের বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র চিড় ধরেনি। মুড়িয়া, মারিয়া, হালবা ও ধুরওয়াদের অবিচল প্রত্যয় তাদের 'দেউতা' বস্তাররাজ প্রবীর ভঞ্জদেও একটি অসম যুদ্ধে পুলিশের গুলিতে নিহত হননি। মা দন্তেশ্বরী তাঁর পুত্রকে লুকিয়ে রেখেছেন। সময় হলে বনবাসীদের দেবতা প্রবীর ভঞ্জদেও আবার তার প্রজাদের সামনে এসে দাঁড়াবেন।

দীর্ঘদেহী, আস্কন্দ কেশ, গাল ভরা দাড়ি, সৌম্য দর্শন দন্তেশ্বরীর পুত্র প্রবীর তার আজানুলম্বিত বাহু উত্তোলন করে বনবাসী প্রজাদের অভয় দেবে না— এই বিশ্বাস বস্তারের বনবাসী প্রজাদের মন থেকে মুছে যায়নি। এই বিশ্বাস নিয়েই দূরদূরান্ত থেকে মারিয়া, মুড়িয়া ও ধুরওয়ারা প্রতিদিন দল বেঁধে জগদলপুরের রাজপ্রাসাদে হাজির হয়। প্রায়ান্ধকার দরবার কক্ষে প্রবীরের বিশাল আলেখ্যের সামনে নতমস্তকে প্রার্থনা করে। অনির্বাণ প্রদীপ শিখায় হাত ছুঁইয়ে নিজেরা মাথায় ছোঁয়ায়। এই একবিংশ শতাব্দীতেও উপজাতিদের বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র চিড় ধরেনি। গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে একদিনের জন্যেও এই ঘটনার ব্যত্যয় ঘটেনি।

অথচ নিষ্ঠুর সত্য হলো, ১৯৬২ সালের ২৫ মার্চ 'দন্তেশ্বরীর পুত্র' বস্তারের শেষ মহারাজা প্রবীর ভঞ্জদেও পুলিশের গুলিতে নিজের প্রসাদেই নিহত হয়েছিলেন। এ এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। এ ঘটনা এখানে নয়— অন্য কোনো সময় অন্য কোনো ভাবে উল্লেখ করা যাবে। তবে দরবার কক্ষের কথা কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। দ্বি-মহলা বিশাল রাজপ্রাসাদ। ১৯৬২ সালে অসম যুদ্ধে প্রবীর নিহত হবার পর মধ্যপ্রদেশ সরকার প্রাসাদের প্রথম অংশ দখল করে নেয়। সেখানে বর্তমানে সরকারি অফিস। অপর অংশে রাজপরিবারের কয়েকজন সদস্য থাকেন। সেই অংশে রয়েছে দরবার কক্ষ। কাকতীয় রাজারা এখানে বসেই বস্তার শাসন করতেন। আদিম উপজাতিদের অভাব অভিযোগ শুনতেন।

প্রবীর ভঞ্জদেও বসতেন দরবার কক্ষে। বর্তমানে কক্ষটি প্রায় অন্ধকার। কক্ষের এক কোণে খুবই কম পাওয়ারের বাল্ব। আর প্রবীরের আলেখ্যের পাশে একটি অনির্বাণ প্রদীপ। ১৯৬২ সালের ২৫ মার্চের পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও ওই প্রদীপ শিখা নির্বাপিত হয়নি। দরবার কক্ষের সব জানালাই বন্ধ। শুধু প্রবেশ দ্বারটি অধোন্মুখ। চারদিকের দেয়াল জুড়ে কাকতীয় রাজন্যদের তৈলচিত্র। ধুলায় ধূসরিত। প্রায়ান্ধকার দরবার কক্ষটিতে ঢুকলেই গা ছম ছম করে। মনে হয় অনেক অশরীরী আত্মা আগন্তুককে ঘেরাও করে আছে। বিশেষ করে সন্ধ্যার সময় দরবার কক্ষটি কেমন যেন অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। প্রবীর ভঞ্জের আলেখ্যর দিকে তাকানো যায় না। মনে হয়, আলেখ্যটি এক্ষুনি সাতফুট লম্বা একটি জীবন্ত মানুষে পরিণত হয়ে যাবে। আজানুলম্বিত হাত প্রসারিত করে নিরীহ প্রজাবৃন্দকে আশ্বস্ত করছেন। কেউ দরবার কক্ষে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। দম বন্ধ হয়ে আসে। সারা শরীরে কম্পন শুরু হয়।

জন্মেছিলেন দার্জিলিং-য়ে। শিক্ষা পেয়েছিলেন লন্ডনে। আধ্যাত্মিকতার পাঠ্য নিয়েছিলেন দন্তেওয়াড়ায়। ইংরেজিতে একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম 'আই প্রবীর, দ্য আদিবাসী গড'। আমি প্রবীর, বনবাসীদের ঈশ্বর। বলা বাহুল্য, ভারত সরকার বই বাজেয়াপ্ত করেছে। সমস্ত কপি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

মা দন্তেশ্বরীর কথা লিখতে গিয়ে তাঁর 'পুত্র' প্রবীরের কথা টানতেই হলো। প্রবীরের বাবা-মায়ের নাম ছিল এক। নির্মলকুমার আর নির্মল কুমারী। দন্তেশ্বরীর সঙ্গে বস্তার রাজপরিবার ও তাঁদের অর্ধনগ্ন প্রজাকুল জড়িয়ে আছে।

রাজা নিহত। রাজস্ব সরকারের হাতে। কিন্তু দন্তেশ্বরীর নিত্যসেবা নিয়মিত হয়। দশেরা উৎসবে সেই জাঁকজমক না থাকলেও, বনবাসীদের সঙ্গে সব শ্রেণীর মানুষ মেতে ওঠে। দন্তেশ্বরীকে কেন্দ্র করেই এই দশেরা উৎসব। দশেরার বিবরণ দেওয়ার আগে দন্তেশ্বরীর গোড়ার কথা একটু বলা যাক। যদিও অনেকে মনে করেন, দন্তেওয়াড়া একান্নপীঠের একটি পীঠ। কিন্তু পীঠস্থানের তালিকায় দন্তেওয়াড়ার নাম নেই। এমনকী উপপীঠের তালিকাতেও দন্তেওয়াড়া অনুপস্থিত। তবুও অনেকের দাবি সতীর ঊর্ধ্বদন্তপাটি দন্তেওয়াড়ার পড়েছিল। পীঠ-উপপীঠের বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। দন্তেশ্বরী বস্তার রাজের জাগ্রতা কুলদেবী। হাজারো বনবাসীদের আরাধ্যা দেবী।

দন্তেশ্বরীর কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বস্তারের কাকতীয় রাজবংশের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে দেবী দন্তেশ্বরীকে।

তেলেঙ্গানার (ওয়া বেঙ্গল) শাসক

ছিলেন প্রতাপ রুদ্রদেও। ১৩৫৩ সালে দিল্লীর বাদশা আলাউদ্দিন খিলজি তেলেঙ্গানা আক্রমণ করে। যুদ্ধে পরাজিত রুদ্রদেও বন্দী হন। মুক্তি পেয়ে নিজের রাজ্য ছেড়ে পাহাড় আর অরণ্যে ঘেরা বস্তারে আশ্রয় নেন। প্রতাপরুদ্রদেব আবার ফিরে যেতে পেরেছিলেন নিজের রাজ্যে। কিন্তু স্বস্তিতে রাজ্য শাসন করতে পারেননি। ১৩২৩ সালে আমেদশাহ বাহমণি আবার তেলেঙ্গানা আক্রমণ করে। প্রতাপ রুদ্রদেও নিহত হন। তাঁর অনুজ অন্নামদেও গোদাবরী অতিক্রম করে বস্তারে আশ্রয় নিলেন। পলাতক অন্নামদেও হঠাৎ পিছনে পরিচিত কণ্ঠের আদেশ শুনতে পেলেন। 'এগিয়ে যা। পিছন ফিরে তাকাবি না। যতক্ষণ নূপুরের নিক্কণ শুনতে পাবি, ততক্ষণ সামনের দিকে চোখ রেখে এগিয়ে যাবি।' শঙ্কিনী আর ডঙ্কিনী নদীর সঙ্গমস্থলে নূপুরের শব্দ থেমে যায়। অন্নামদেও পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন সহাস্যবদনা দেবী দন্তেশ্বরী দাঁড়িয়ে আছেন।

দন্তেশ্বরীর আদেশে শঙ্কিনীর ধারেও নতুন রাজত্বের পত্তন করেন। রাজধানী স্থাপন করেন সেখানেই। দন্তেশ্বরীর নামানুসারে জায়গার নামকরণ করেন দন্তেওয়াড়া। নির্মাণ করেন দন্তেশ্বরীর মন্দির। প্রতিষ্ঠা করেন কালো কষ্টি পাথরের দুর্গামূর্তি।

দন্তেওয়াড়া জগদলপুর থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার। যাতায়াতের কোনো অসুবিধা নেই। ট্রেনও চলে, বাসও চলে।

বস্তারে শতাধিক বছর রাজত্ব করেছেন কাকতীয় রাজারা। এর মধ্যে কয়েকবার রাজধানী স্থানান্তর করেছেন। শেষবারের রাজধানী স্থানান্তর করা হয় জগদলপুর। তাও প্রায় দশ বছর পূর্বে।

দেবী দন্তেশ্বরীর মন্দির দন্তেওয়াড়ায় অবস্থিত হলেও, জগদল প্রাসাদের প্রধান প্রবেশদ্বারের বাঁদিকে আরও একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে দন্তেওয়াড়ার আদলে গড়া আর একটি মূর্তি। মন্দির আর প্রাসাদের মধ্যে যুক্ত রয়েছে একটি সুড়ঙ্গপথ। এই সুড়ঙ্গপথে দেবী দর্শন করতে আসতেন রাজপরিবারের সদস্যগণ। বর্তমানে সুড়ঙ্গ পথটি বন্ধ।

দন্তেওয়াড়া ও জগদলপুরে একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় দশেরা উৎসব। জগদলের অনেক বয়স্ক ব্যক্তি দশেরার জাঁকজমকের জীবন্ত সাক্ষী। বর্তমানে তাঁরাই জৌলুসহীন দশেরার নির্লিপ্ত দর্শক।

দশেরার জাঁকজমক না থাকলেও চমকের অভাব নেই। দশেরার মূল আকর্ষণ ন'টি কুমারী পুজো। আর কোথাও একসঙ্গে কুমারী পুজো হয় কিনা, আমার জানা নেই।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজকুলদেবী দন্তেশ্বরীর তুষ্টি সাধন শুরু হয়। মন্দিরের বাইরে হাজারো ভক্ত। দেবীকে প্রসন্ন করতে ব্যস্ত একটি বারো বছরের কম বয়সী কন্যা।

সেই কন্যাটিকে বিশেষ পোশাকে সজ্জিত করা হয়। তার সারা অঙ্গে স্বর্ণালঙ্কারের আভরণ। কন্যাটির মাতুল পুরোহিতের ভূমিকা পালন করে। সুগন্ধি আগরবাতি দিয়ে কুমারীকে আরতি করা হয়।

ধূপ ধুনো আর মন্ত্রোচ্চারণে মন্দিরের মধ্যে একটি স্বর্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে দেবীত্বের প্রভাব ফুটে ওঠে। হাজার হাজার মানুষ সেই দৃশ্য অবলোকন করে ধন্য হয়।

দ্বিতীয় দিনের উৎসবকে বলা হয় 'কলস স্থাপন'। অনেকদিন আগে থেকেই কলস স্থাপনের দিন তারিখ ঠিক করা হয়। দন্তেওয়াড়া ও জগদলপুরে একই সময়ে কলস স্থাপন করা হয়। একজন হালবি সম্প্রদায়ের মানুষকে যোগী হিসাবে নির্বাচন করা হয়। পরবর্তী ন' দিনের দায়িত্বভার তারই উপর অর্পিত থাকে। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হয় 'যোগী বিঠানা'।

মাটিতে একটি গর্ত করে তার মধ্যে একটি তক্তা পেতে দেওয়া হয়। গর্তের ঠিক মাঝখানে একটি বেদী তৈরি করা হয়। তার উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয় কিছু সোনালি গম। পূর্বদিকে মুখ করে সেখানে বসেন যোগী। উদ্দেশ্য রাজ্যের মঙ্গল। রাজ্যের মঙ্গল কামনা অন্নাম দেওয়ের আমল থেকেই এই প্রথা চলে আসছে।

তৃতীয় দিন মা দন্তেশ্বরীর স্বর্ণছাতা রথে নিয়ে মিছিল বের হয়। মাদল নিয়ে সজ্জিত ঘোড়ায় বসে মিছিলের নেতৃত্ব দেয় মাহার, মুণ্ডা হলবা, বালুকারা ও অন্যান্য বনবাসীগোষ্ঠী। তারা যথাযথভাবে নিজেদের ভূমিকা পালন করে।

শালকাঠের তৈরি এই রথেরও অনেক বিশেষত্ব আছে। একমাত্র ভাত্রা সম্প্রদায়ের মানুষই এত রথ তৈরির অধিকারি। রথ টানতে পারে মুড়িয়া আর বুরওয়া সম্প্রদায়ের মানুষ।

নবরাত্রির দিন শুরু হয় কুমারী পুজো। এইদিন ন'টি কুমারীকে নানা আভরণে সজ্জিত করা হয়। শুরু হয় কুমারী আরাধনা। ঠিক এই দিনই 'বিঠানা' থেকে বেরিয়ে আসে যোগী। স্নান সেরে নতুন ধুতি পরে কুমারী পুজোয় অংশ নেয় সে।

এই দিন মা দন্তেশ্বরীকে বাইরে আনা হয়। পাল্কীতে বসিয়ে পথ পরিক্রমা করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি শুধু দন্তেওয়াড়ায় হয়। জগদলপুরে এই অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ।

বিজয়া দশমীর দিন নতুন তৈরি অন্য একটি রথে দেবী দন্তেশ্বরী জগদল শহর পরিক্রমা করেন। এই রথ টানার অধিকারি দণ্ডামী মারিয়া সম্প্রদায়ের লোকেদের। পরের দিন দেবী দন্তেশ্বরী মন্দিরে ফিরে যান। দশেরা উপলক্ষে বস্তারের বনবাসীরা আনন্দে মেতে ওঠে। পাহাড়ে-অরণ্যে মাদল বাজে। নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়েরা সাধ্যমত নতুন জামা কাপড় পরে। ছেলেরা মাথায় তোলে নতুন পাগড়ি। মেয়েরা খোপায় গোঁজে ফুল। তারপর দশমীর চন্দ্রালোকে পুরুষ ও রমণী পরস্পরের কোমর জড়িয়ে গান গায় :

'এটি একটি গাড়ি, তুমি কি চালাতে পারো?
এটি একটি পথ, তুমি কি যেতে পারো?
এটি একটি ঘোড়া, তুমি কি চড়তে পারো?'

জগদলপুর ও দন্তেওয়াড়ায় উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই উৎসবে রাবণকে দাহ করা হয় না। ■

প্রণাম জানাই সেই অবিস্মরণীয়াকে

রূপশ্রী দত্ত

অবিস্মরণীয়া শ্রীমতী কমলা মুখোপাধ্যায়। স্বাধীনতা-সংগ্রামী এই অসামান্যা নারী অদ্ভুতভাবেই আমার মতো নগণ্যজনের জীবনে কিছুদিনের জন্য জড়িয়ে গিয়েছিলেন।

গত শতাব্দীর ছয়ের দশকের গোড়ায়, অদ্ভুত যোগাযোগে, বালিকা শিক্ষা সদনের শিক্ষিকা হিসেবে তিনি এসেছিলেন, আমার গৃহশিক্ষিকা হয়েছিলেন। স্কুল ছাড়তে তখন এক বছর বাকি। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতিও অতি সুন্দর ছিল। গল্পচ্ছলে, ভারী সুন্দরভাবে পাঠ্যবিষয়গুলি বোঝাতেন। গৌরবর্ণা, নাতিদীর্ঘা, কাঁচাপাকা চুল কমলাদি তাঁর স্কুলের কথা, তখনকার শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলতেন। কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন, শিয়ালদহ এলাকার, প্রাচী চিত্রগৃহের কাছাকাছি তাঁর বাসস্থান। যথা সময়ে আমি বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। তারপর আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি।

এর তিনদশক পর, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে দূরদর্শনের এক বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছিল। হঠাৎ পর্দায় লেখা ফুটে উঠল— 'অপ্রধান নারী স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা'। আর কি আশ্চর্য! ফুটে উঠল কমলাদির মুখ। তিন দশক পরেও যা চিনতে ভুলে হয় না— শুধুমাত্র বার্ধক্যের বলিরেখা কিছুটা সময়ের চিহ্ন রেখে গেছে। আমি তখন বিস্ময়ে হতবাক! তিনি বলে চলেছেন— অগ্নিযুগের, প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। কথাগুলো কানেও ঢুকছিল না। কেবলই মনে হতে লাগল— তিনি তো কোনোদিনই মুখ ফুটে বলেননি তাঁর গৌরবময় অতীতের কথা। তাহলে তো সে যুগের কত বিস্ময়কর, আকাঙ্ক্ষিত তথ্যই তাঁর মুখ থেকে শোনা যেত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে সেদিন 'প্রাচী' সিনেমা- সংলগ্ন বাসস্থানের প্রসঙ্গও উঠে এসেছিল তাঁর কথায়। আত্মপ্রচারবিমুখ এই অসামান্যার প্রতি শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা নানা কারণে আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে তাঁর জীবনী সম্পর্কে কিছু তথ্য জোগাড় করলাম। প্রত্যক্ষভাবে, ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় যা জানা সম্ভব হয়নি,

তাই জানলাম পরোক্ষসূত্রে।

কমলা মুখোপাধ্যায় জন্মেছিলেন ১৯১৩ সালের ২৪ মে, হুগলী জেলার বাণীপুর অঞ্চলে। তাঁর পিতার নাম প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাড়িতে ছিল প্রগতিশীল পরিবেশ। প্রমথনাথ গ্রেপ্তারি এড়াতে বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মগোপন করতেন। পরবর্তীতে নিরুদ্দেশ হন। মৈমনসিংহ বিদ্যাময়ী স্কুলে তাঁর মা কর্মে নিযুক্ত হন। কমলা মুখোপাধ্যায় সেখান থেকেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৭ সালে যখন সাইমন কমিশন বয়কটের উদ্দেশ্যে সারাদেশ উত্তাল, তখন তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা স্কুলে ধর্মঘট করেছিলেন। পরিণামে তিনি হোস্টেল থেকে বহিষ্কৃত হন। এরপর কলকাতায় স্কটিশচার্চ কলেজ। মেয়েদের স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করার কাজে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। গোপন ইস্তাহার বিলি, অস্ত্রভাণ্ডারের সন্ধান রাখা, প্রয়োজনমতো বিপ্লবীদের দেওয়া, বিদেশি দ্রব্যবর্জন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে তিনি জড়িয়ে পড়েন। তিনি 'যুগান্তর' দলের সদস্যা হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, ছ' বছরের নির্বাসন দণ্ড পেয়েছিলেন। পরিণত বয়সে গত শতকের শেষের দিকে কোনো এক সময় এই অলোকসামান্যা নারী প্রয়াত হন। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী অতিক্রম করে এসেছি দু' বছর আগে। তাঁকে সর্বান্তঃকরণে প্রণাম জানাই। ▮

এক বটবৃক্ষের কথা

আমি একটা বটগাছ। আমার জন্ম হয়েছিল এক প্রকাণ্ড মাঠে, কিন্তু ভাগ্যদোষে এখন আমি বন্দি ছোট্ট একটা টবে। আমি নিজেকে বৃক্ষ বলছি না, কারণ বৃক্ষ বলতে যা বোঝায় আমি তা নই। আমাকে তা হতে দেওয়া হয়নি। অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু বার বার কেটে ছোট করে দেওয়া হয়েছে আমাকে। টবের মধ্যে রেখে আটকে দেওয়া হয়েছে আমার শেকড়কে। যাতে মাটির গভীরে প্রবেশ করতে না পারে। সকালে আর বিকেলে আমাকে একটু করে জল দেওয়া হয়। আমি তাতেই আমার তৃষ্ণা নিবারণ করি। কোনো কোনো দিন আবার তাও জোটে না। কেউ জানে না, তখন আমার কষ্ট হয়! তেষ্টায় বুক ফেটে যায়, একটু জলের জন্য ছটফট করতে থাকি। মাটির ভেতর কত জল, কত সার। অথচ আমি তা নিতে পারি না। আমার শেকড় তো সেখানে যেতে পারে না, জোর করে আটকে দেওয়া হয়েছে।

আকাশে যেদিন মেঘ ঘনিয়ে আসে সেদিন আমার খুব আনন্দ হয়। আকাশ পানে চেয়ে থাকি কখন বৃষ্টি নামবে, একটু সিক্ত হবে আমার শরীর। অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামলে আমার পাতাগুলো সব আনন্দে মেতে ওঠে। আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দেই। বলি— মানুষ নিষ্ঠুর নির্দয় হতে পারে, ভগবান তুমি তো নও। মাঝে মাঝে এই বৃষ্টিটুকু দিয়ে আমায় তুমি বাঁচিয়ে রেখ।

গ্রামের শেষে সেই ধূ ধূ মাঠে যখন আমার জন্ম হলো, তখন খুব আনন্দ হয়েছিল আমার। নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম এইতো আমার আদর্শ জায়গা। এখানে আমি ডালপালা ছড়িয়ে এক বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হব। কত পাখি এসে বাসা বাঁধবে আমার ডালে। তাদের কূজনে মুখর হয়ে থাকবে চারিদিক। পথক্লান্ত পথিক এসে বিশ্রাম নেবে আমার শীতল ছায়ায়। আমার শরীর থেকে অসংখ্য ঝুরি নামবে। শিশুরা এসে তাতে দোল খাবে। কত আনন্দে খেলা করবে তারা। এইভাবে সবাইকে আশ্রয় দিয়ে, শীতল ছায়া বিলিয়ে মহাআনন্দে কাটবে আমার দিন।

কিন্তু হায় কপাল, বিধাতা আমায় সে সুখ দিল না! একদিন বিকেলবেলা আমার নতুন বেরনো পাতাগুলিকে আমি ঘুম

পাড়াচ্ছিলাম। এমন সময় কোথা থেকে এলো এক যমদূত। হাতে একটি কোদাল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই যমদূতের মতো মানুষটি আমার চারিদিকে খুঁড়তে লাগলো। আমি তাকে বললাম— একি করছো তুমি। আমার চারিদিকে খুঁড়ছো কেন? আমি কাঁদতে লাগলাম, কিন্তু সে শুনলো না আমার কথা। মাঠ থেকে তুলে নিয়ে গেল আমাকে। তারপর তার বাগানবাড়িতে একটা টবে বসিয়ে দিল আমায়। কত স্বপ্ন ছিল আমার, সেদিন সব গেল ভেঙে। এখানেই শেষ নয়, পরের দিন বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিল আমাকে। চিরদিনের মতো আমি বন্দি হলাম তিনতলাবাড়ির এই ছোট্ট টবে। তখন থেকে আমি এখানেই আছি, এই ছাদে।

আমি এখন করুণার পাত্র। কোনো পাখি এসে বাসা বাধে না আমার ডালে। ছোট্ট ছোট্ট পাখিরা এদিক ওদিক এসে খেলা করে। মাঝে মাঝে এসে আমার ডালেও বসে। আমি ভাবি, এই বুঝি সে এলো আমার কাছে থাকতে। কিন্তু সে থাকে না, অতো জায়গা কোথায়? একটু পরেই উড়ে পালিয়ে যায়। একদিন এক পাখিকে আমি বললাম—তোমরা থাকো না কেন আমার কাছে? পাখিটি বলল— বড় ভয় করে তোমার ওই বাবুটিকে, পাছে আমাকেও বন্দি করে। আমারো বড্ড ভয় করে বাবুটিকে।

প্রতি বসন্তে আমার এখনো নতুন পাতা আসে, ছোট্ট ছোট্ট ডালপালায় ভরে উঠতে থাকি আমি। মনে মনে ভারী আনন্দ হয়, আবার তৎক্ষণাৎ ভয়ে শিউরে উঠি। ওই বুঝি বাবুটি আসছে হাতে কাঁচি নিয়ে, আমার কচি কচি ডালপাতা কাটবে বলে। প্রতি রবিবার বাবুটি ছাদে আসে। হাতে সেই কাঁচি। কেটে কেটে ন্যাড়া করে দেয় আমাকে। আমি যে বড় হতে চাই, বৃক্ষ হতে চাই, কে বোঝাবে তাকে! কত অপমান সইতে হয় আমাকে। এই তো সেদিন এসেছিল এক খোকাবাবু। ভাঙা দাঁতের বিটকেল হাসি হেসে বলল— এ আবার বটগাছ! আমি মনে মনে বললাম— খোকা, বন্দি হলে তবে বোঝা যায় কী এই বন্দিদশা।

মনে আমার বড় ব্যথা। কেউ সেটা বোঝে না। কাকেই বা বলি? বড় কষ্টে আছি আমি। তবু নাম আমার বট। কারো উপর রুষ্ট হতে পারি না। এটা যে আমাদের স্বভাবধর্ম। শত অপমান, অনাহার, তবু ক্ষমা করে দেই নিষ্ঠুর বাবুটিকে, আর সেদিনের সেই যমদূতটিকে।

বিরাজ নারায়ণ রায়

রাজ্য পরিচিতি

কর্ণাটক

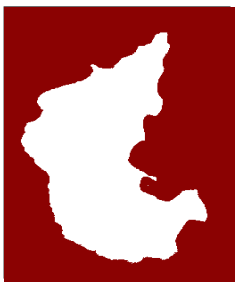

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের একটি রাজ্য কর্ণাটক। কন্নড় ভাষা করুনাড়ু থেকে কর্ণাটক নামটি এসেছে। যার অর্থ সুন্দর উচ্চভূমি। আরব সাগরের তীরে অবস্থিত এই রাজ্যটির পূর্ব নাম ছিল মহীশূর। কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরু। প্রযুক্তিতে উন্নত হওয়ায় এই শহরকে বিজ্ঞাননগরী বলা হয়।

কৃষ্ণা, কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি নদী এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এখানকার অন্যতম তীর্থস্থানগুলি হলো— শৃঙ্গেরী মঠ, বসবকল্যাণ, শিবগঙ্গা, শ্রবণবেলগোলা। মাধবাচার্য, বসবেশ্বর প্রমুখ মহাপুরুষ এখানে আবির্ভূত হয়েছেন। কর্ণাটকের আয়তন ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৯১ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৬ কোটি ১৩ লক্ষ ৭০৪ জন। এখানকার প্রধান ভাষা কন্নড়।

প্রশ্নবাণ

১.শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্ দিনে কল্পতরু হয়েছিলেন?

২.'তিতাস একটি নদীর নাম'—উপন্যাসটি কার লেখা?

৩.বাংলায় প্রথম নারী আত্মজীবনী কোন্‌টি? কে লিখেছেন?

৪.কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য কে?

৫.ভারতীয় জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : ১. ১ জানুয়ারি। ২. অদ্বৈত মল্লবর্মণ। ৩. 'আমার জীবন', রাসসুন্দরী দেবী। ৪. সুগত মারজিত। ৫. কলকাতা।

ছবিতে অমিল খোঁজ

ছোটদের কলমে

শীতের মজা

বিরজু সরদার, সপ্তম শ্রেণী

শীতকালে ভারী মজা
খেতে ভালো তিল খাজা,
রসে ভরা পিঠেপুলি
যত ইচ্ছে ততগুলি,
খেয়ে নে যত পাস
পাবি না যে বারোমাস।

রবিবারে রোদে বসে
কমলালেবু হাতে হাতে,
চড়ুইভাতি হলে পরে
আনন্দ আর ধরে না রে,
সার্কাস আর চিড়িয়াখানা
লুটে নাও মজাখানা।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

বিজ্ঞাপন বিভ্রান্ত করছে মহিলাদের

সুতপা বসাক ভড়

স্বাধীনতার পরে অনেকগুলো বছর কেটে গেল। মেয়েদের শিক্ষা, মতামত, সংস্কার, স্বাধীনতা ইত্যাদি নিয়ে দেশে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। মহিলা সশক্তিকরণের পথে আমরা এগিয়ে চলেছি। বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে মহিলাদের সংরক্ষণের ব্যাপারেও আলোচনা হচ্ছে। আজকের মেয়েরা পড়াশুনা শিখে শুধুমাত্র বাড়িতেই বসে নেই। তারা দশভুজা মা-দুর্গার মতো সংসার, কর্মক্ষেত্র সবদিক সামলাতে দায়বদ্ধ। আর্থিক দিক থেকেও পরমুখাপেক্ষী নয় এইসব কার্যরতা মহিলারা। স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত উপার্জন নিঃসন্দেহে সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আনছে, আনছে নিরাপত্তা। এপর্যন্ত সব ঠিক আছে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় মহিলাদের আয়ের একটা বড় অংশ সাজগোজ-বাহ্যিক আড়ম্বড়ে খরচ হয়ে যায়। আবার অনেক আন্তর্জাতিক কোম্পানি তাদের অফিসে কর্মরতা মহিলাদের কিছু পাশ্চাত্য পোশাক নির্দিষ্ট করে দেয়। এইভাবে তারা আমাদের দেশের পারম্পরিক পোশাককে পরোক্ষভাবে অবহেলা করে কৃত্রিমতা চাপিয়ে দিচ্ছে।

বড় বড় শহরের দোকানে প্রায়ই দেখা যায় আপাদমস্তক কৃত্রিম সাজসজ্জায় সজ্জিত কিছু কিশোরী-যুবতী বিদেশি পুতুলের মতো সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকে। এদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া থাকে যে মহিলা ক্রেতা দেখলেই কিছু বিশেষ কোম্পানির প্রসাধন সামগ্রী কেনার জন্য তাদের প্ররোচিত করে।

আসলে, চাকুরিরতা মহিলাদের আর্থিক সঙ্গতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ওইসব কোম্পানিগুলি। তাদের গ্রাহকদের মধ্যে চাকুরিরতা মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। ওই সংখ্যাটা আরও কয়েকগুণ বাড়ানোই তাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যপূরণের জন্য তারা সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে আমাদের মানসিকতাকে বাইরের চাকচিক্যের দিকে আকৃষ্ট করে। যেমন, টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে দেখানো হচ্ছে যে, হাত-পায়ের স্বাভাবিক রোম মেয়েদের সৌন্দর্য কমিয়ে দেয়। সুতরাং কোম্পানিগুলির বক্তব্য তাদের বানানো প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করলে মহিলারা আরও সুন্দর হয়ে উঠবেন। অথচ ওইসব জিনিস একবার ব্যবহার করতে শুরু করলে আর ফেরার রাস্তা থাকে না। ক্রেতা বাধ্য হবেন ওইগুলি কিনতে এবং বিক্রেতা দীর্ঘদিনের জন্য লাভান্বিত হতে থাকবে।

সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের পারম্পরিক সাজ-সজ্জায় কয়েকবছর আগে পর্যন্ত ওইসব দ্রব্যের বিশেষ ব্যবহার ছিল না।

গোটা বছর ফর্সা টুকটুকে থাকার জন্য নানারকম প্রসাধনী আমাদের বোকা বানাচ্ছে। একটু ভাবুন তো, আমাদের দেশের জলবায়ুতে মেমসাহেবের মতো ফ্যাকাশে ত্বক হওয়ার তো কথা নয়! —এ শুধু শ্যামলা মেয়েদের মধ্যে হীনমন্যতা তৈরি করে। কোম্পানিগুলির বানানো প্রসাধনীর তালিকা অন্তহীন— কোনটা দিয়ে মুখ ধোয়, কোনটা মেখে বসে থাকে, কোনটা ঘষতে থাকে, তা সত্ত্বেও ভারতে শ্যামবর্ণা মেয়েদেরই প্রাধান্য। এটাই স্বাভাবিক। তাহলে আমরা ওইসব জিনিস কিনে বারবার কেন অপচয় এবং নিজেদের অপমানিত করতে থাকব?

চুলের যত্ন সম্বন্ধে যত বলা যায় কম হবে। বিজ্ঞাপনে চুল পড়া নিষেধ। অথচ বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, দিনে ৩০-৪০টা চুল পড়া খুবই স্বাভাবিক। পুরনো চুল পড়বে, তবেই তো নতুন গজাবে? এমনভাবে মডেল চিরুনি দেখে যেন ঝরা চুল গোনাই তাদের জীবনের একমাত্র কাজ। তেল, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, ক্রিম, ফেসওয়াশ ইত্যাদির বিজ্ঞাপনগুলি বেশিরভাগই কম্পিউটারে এডিট করা হয়ে থাকে। বেশ কয়েকবছর আগে হলিউড অভিনেত্রী জুনিয়া রবার্টসের বিজ্ঞাপনসহ একটি বিশেষ প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করলে বয়স বোঝা যায় না এমন দাবি করেছিল একটি কোম্পানি। এডিট করা ছবিটিতে ক্রেতাদের মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার জন্য আদালতে বিচার হয় এবং কোম্পানিটি দোষী সাব্যস্ত হয়। আদালতের নির্দেশ ছিল ক্রেতাদের বোকা বানানো যাবে না। প্রসাধন ব্যবহার করে যা হচ্ছে তারই ছবি বিজ্ঞাপনে দিতে হবে। কোনোরকম এডিটিং করা যাবে না। আমাদের দেশে শক্ত আইন না থাকার জন্য আমাদের বোকা বানিয়ে চলেছে ওরা।

একটি বিজ্ঞাপনে মা'র কালো চুলের রহস্য জানতে চায় তার যুবতী কন্যা। অপরটিতে যুবক পুত্র পাশ্চাত্যের উত্তেজক পোশাক পরিহিতা লাস্যময়ী মাকে প্রশ্ন করে তার যৌবনের রহস্য কী? নিজের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান-সন্ততির কাছে মা'র এ কী রূপ? লজ্জা, লজ্জা! আমাদের 'পাকা মাথার বুদ্ধি' কোথায় গেল? পরিপক্ক বয়সে মাথায় রুপালি ঝিলিক— এতো ব্যক্তিত্বের অপূর্ব প্রকাশ!

প্রকৃতির ঈশ্বরপ্রদত্ত জিনিসকে অস্বীকার করা অন্যায়। তেল সাবান দিয়ে প্রত্যহ স্নান করলে সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী হতে পারি আমরা। ত্বকের সমস্যার সমাধানে দিনে দু'তিন লিটার জল আর শাঁখের গুঁড়ো খুবই ভালো। চুলের জন্য রইল নারকেল তেল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রামের কালো মেয়েটিকে 'কৃষ্ণকলি' বলে গৌরবান্বিত করেছেন। আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলি চায় আমাদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা, অতৃপ্তি, বাড়াতে। তবে আমরা তাদের পাতা ফাঁদে পা দেব না। স্বদেশি দ্রব্য, স্বদেশি মানসিকতায় আমরা ওদের বাণিজ্যিক দাবি থেকে অনেক উঁচুতে নিজেদের স্থান করে নিয়েছি। সে পথ চরম বিকাশের ও পরম শান্তির। সেটাই তো সেরা পাওয়া। যা কোনো বাহ্যিক প্রসাধন দিতে পারে না। ▮

অবশেষে ভারতের অর্থনীতি মুখ তুলে চাইতে শুরু করেছে

অতিথি কলম

রাজীব কুমার

গত কয়েক সপ্তাহে দেশের অর্থনীতির পক্ষে বলার মতোই বেশ কিছু সুখবর রয়েছে। প্রথমত, তুর্কমেনিস্থানের প্রাচীন মারি শহরে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা ৭৬ বিলিয়ন ডলারের টিএপিআই গ্যাস পাইপ লাইন সংক্রান্ত চুক্তিতে সই করেছে ভারত ও তুর্কমেনিস্থান।

দ্বিতীয়ত, এর ঠিক আগের দিনই ভারত সফররত জাপানের প্রধানমন্ত্রী সিনজো আবে আমেদাবাদ ও মুম্বই-য়ের মধ্যে প্রস্তাবিত বুলেট ট্রেনের লাইন তৈরি বাবদ প্রায় বিনা সুদে ১২ বিলিয়ন ডলারের ঋণ মঞ্জুর করেছেন।

এরই ঠিক এক সপ্তাহ আগেই বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর কর্পোরেট সংস্থা জিই ও অ্যালস্টম বিহারে রেল লোকোমোটিভ নির্মাণের দুটি কারখানা খোলার কথা ঘোষণা করেছে। প্রকল্পে বিনিয়োগ হবে ৫.৭ বিলিয়ন ডলার। একেবারে কোর সেক্টরের এই তিনটি বিশাল প্রকল্পের

> “দেশকে অধোগতির দিকে টেনে নামালে তার সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতিবাচক অভিঘাতের আগুন কিন্তু সব রাজনৈতিক দলের ঘরেই লাগবে। আর দেশের কোণে কোণে ওঁৎ পেতে থাকা মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলি এই সুযোগকেই কাজে লাগাবে।”

মিলিত অঙ্ক বিপুল। ২৫.৩ বিলিয়ন ডলার বা ১.৬৯ লক্ষ কোটি টাকা।

প্রসঙ্গত, এই তিনটি প্রকল্প সম্মিলিতভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পটভূমি বদলে দেওয়ার ক্ষমতা ধরে। অথচ এগুলি আটকে আছে দীর্ঘদিন। বলতে দ্বিধা নেই, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের পক্ষে আমিই উল্লেখিত টিএপিআই প্রকল্পের সূচনা করেছিলাম। আশা করা যায় এই তিনটি প্রকল্প রূপায়ণের শুরুর সূত্রে আরও ৬০টি বিশাল আকারের পূর্ববর্তী সরকারের হাতে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা প্রকল্পও বাস্তবায়িত হওয়ার পথ দেখবে। গত নভেম্বরের প্রথম দিকে নীতি আয়োগের কর্তাদের সঙ্গে বসে প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পগুলির দীর্ঘদিন আটকে থাকার নির্দিষ্ট কারণগুলি উদ্ধার করতে পারায় এগুলিকে রূপায়ণের পথে নিয়ে আসতে তাঁর বাস্তবিকই যথেষ্ট সুবিধে হয়েছে।

এছাড়া বলার মতো আরও বিষয়ের মধ্যে আসবে এপ্রিল থেকে জুন ত্রৈমাসিকে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ ছুঁয়ে চীনের হারকে ছাড়িয়ে গেছে। শিল্প উৎপাদনের সূচকে (ইনডেক্স অফ ইনডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশান) ৯.৮ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে শুধু অক্টোবর মাসেই। এই বড় বৃদ্ধির কারণে এপ্রিল থেকে অক্টোবরের গড় বৃদ্ধি এক লাফে ২০১৪-এর সমসময়ের ২.২ শতাংশকে পেছনে ফেলে ৪.৮ শতাংশ অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে।

ইঙ্গিতবাহী সূচকগুলি :

অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক গাড়ি বিক্রি একটি বিশেষ আলোচ্য ইন্ডিকেটর। জুলাই ২০১৫ থেকে বাণিজ্যিক গাড়ি বিক্রি বাড়তে থাকে। একে অনুসরণ করে যাত্রী গাড়ির বিক্রিতেও বৃদ্ধি শুরু হয়। এরপর এপ্রিল-অক্টোবরের excise duty সংগ্রহও গত বছরের সমসময়ের তুলনায় ৩৪ শতাংশ বেড়েছে। প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ বেড়েছে ১৫ শতাংশ যা অবশ্যই আয়-ব্যয় ভারসাম্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সদর্থক ভূমিকা নেবে। অর্থাৎ সামগ্রিক আয় বাড়বে। আর এই সূচকগুলিই অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধির প্রতিনিধিত্বমূলক সূচক। এছাড়া মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে পাইকারি মূল্যসূচক (WPI) দীর্ঘদিন নেগেটিভ অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করছে (– ৩.২ শতাংশ) (এপ্রিল-নভেম্বরের পরিসংখ্যান)। আর কনজুমার্স প্রাইস ইনডেক্স অর্থাৎ ভোগ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতি বিগত ৭ মাস ৪.৭ শতাংশে স্থির থাকার পর অক্টোবরে ৫.৭ শতাংশ ছুঁলেও আর বি আই-এর হিসেব অনুযায়ী অর্থবর্ষের শেষে তা লক্ষ্যমাত্রা ৬ শতাংশের মধ্যেই থাকবে। এর ওপর যে ক্ষেত্রটি দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে পড়ে থেকেছে সেই কৃষিক্ষেত্রও অবাক করে দু'টি মরশুমের কিছুটা ঘাটতির বর্ষা সত্ত্বেও দ্বিতীয়

ফঃ ৪

ত্রৈমাসিকে ২.২ শতাংশ বৃদ্ধি দেখাতে পেরেছে। এই পরিসংখ্যানগুলি পর্যাপ্তভাবে স্পষ্ট করে দিচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের অর্থনীতি নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত গতিপথে এগিয়ে চলেছে।

তথ্যগুলি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে ইতিমধ্যেই অর্থনীতি ক্ষেত্রে হতাশাব্যঞ্জক কিছু খবর অগ্রগতির চিহ্নগুলিকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। যেমন, ট্রাক্টর বিক্রি ক্রমান্বয়ে কমে যাওয়া বা খাদ্য সংক্রান্ত ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক-ঋণের পরিমাণে হ্রাস পাওয়ার মতো নঙর্থক ইঙ্গিতগুলি বাড়ছিল। অন্যদিকে কর্পোরেট ক্ষেত্রে বিক্রি কমার ফলস্বরূপ এপ্রিল-সেপ্টেম্বরে শেষ হওয়া দু'টি ত্রৈমাসিকে তাদের মার্জিন ধরে রাখা (লাভ বজায় রাখা) কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছিল। পরিণতিতে বিনিয়োগের পরিবেশের ক্ষেত্রে হতাশাজনক পরিস্থিতির সঙ্কেত পাওয়া শুরু হচ্ছিল। অর্থনীতি তা কাটিয়ে উঠেছে।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে :

উল্লেখিত পুনুরুত্থানের সূচকগুলি পরিলক্ষিত হতে বেশ দেরি হলেও এবার সদর্থক পরিসংখ্যানগুলি অবশ্যই বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি আসবে। অবশ্যই এগুলি রাতারাতি ঘটবে না। কারণ আর বি আই গভর্নরের রিপোর্ট অনুযায়ী বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানেই এখনও ৩০ শতাংশ বাড়তি উৎপাদন করার ক্ষমতা রয়ে গেছে। তবুও উৎপাদন নেমে যাওয়া তো অবশ্যই আটকানো গেছে। এই পরিস্থিতিতে অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নজর দিতে হবে বড় আকারের সরকারি মূলধন বিনিয়োগের ওপর (Public capital experditure), যাতে শুরু হওয়া বৃদ্ধি আরও গতিশীল হতে পারে।

বিরোধীদের কর্মকাণ্ড :

অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে দেশের এই অর্থনৈতিক প্রগতির পটভূমিতে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জিএসটি বিল বিরোধীরা কিছুতেই রাজ্যসভায় পাশ হতে দিচ্ছে না। অথচ (জিএসটি) একথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে এই বিলের বিষয়বস্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময়। দেশীয় ও বৈদেশিক উভয় বিনিয়োগকারীরই যথেষ্ট সুবিধে পাওয়ার আশা করে এই আইন লাগু হলে। দেশের প্রাচীনতম কংগ্রেস দল যারা সম্পূর্ণ অবগত হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র বিরোধিতা ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসাকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনাকে নষ্ট করছে। ভারতের শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রের অজস্র বিদেশি অংশীদাররা গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে ভারতে এই ধরনের নেতিবাচক কার্যকলাপ কী দৃষ্টিতে দেখছে!

কিন্তু রাহুল গান্ধী ও তাঁর দলবলের মাথায় রাখা উচিত এই ধরনের ধ্বংসাত্মক কৌশল কিন্তু backfire করতে পারে। যে দেশের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশি তরুণ সেখানে আরও দীর্ঘদিন ধরে যদি চাকরি ক্ষেত্র নিষ্ফলা থেকে যায়, কোনো সুযোগ সেখানে সৃষ্টি না হয় তারা কিন্তু ধৈর্য হারাবে। দেশকে এই ভাবে অধোগতির দিকে টেনে নামালে তার সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতিবাচক অভিঘাতের আগুন কিন্তু সব রাজনৈতিক দলের ঘরেই লাগবে। আর দেশের কোণে কোণে ওৎ পেতে থাকা মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদী শক্তি এই সুযোগেরই অপেক্ষা করে। তারা এই বিপুল বিক্ষুব্ধ ও নিরাশ যুবশক্তিকে তাদের জঘন্য উদ্দেশ্য সাধনের কাজে নামাবার জন্য মরিয়া চেষ্টা করবে। যার পরিণাম হবে ভয়াবহ। তাই বিরোধী দলের পক্ষে এখনও সময় আছে ক্ষুদ্র দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এই অতি ক্ষণস্থায়ী দেশবিরোধী স্বার্থ সিদ্ধির কাজ থেকে সরে আসা।

শাসক দলের ভূমিকা :

এত কিছুর পরও কিন্তু এটা বলা দরকার যে শাসক বিজেপি দলও কিন্তু এই রাজনৈতিক অবরুদ্ধতার জন্য তার দায় এড়াতে পারে না। সংসদীয় কার্যপ্রণালী চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলির সঙ্গে একটা কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো সহযোগিতার পরিবেশ যেই মাত্র সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেই মুহূর্তেই দলের অগুনতি বাচাল নেতা বা আধা-নেতারা তাদের প্রায়শই পারম্পর্যহীন যে কোনো তুচ্ছ বিষয়ে অপমানজনক বাক্যবাণ বিরোধীদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে কিছু অর্বাচীন কার্যকলাপ। যেমন ধরুন গো-মাংস খাওয়া বন্ধ, এর পরে পরেই National Herald মামলা যার অনেকটাই এক নেতার ব্যক্তিগত আক্রোশ-প্রসূত ও একান্তই কংগ্রেস দলের নিজস্ব। আবার হঠাৎ করে পুরনো এক অভিযোগে কেজরিওয়ালের প্রধান সচিবের দপ্তরে হানা। এগুলির সম্মিলিত প্রভাব ছন্নছাড়া বিরোধীদের পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো হঠাৎ করে এককাট্টা হতে সুবিধে করে দিয়েছে। ধাক্কা খাচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিমুখে স্থিত থাকার আন্তরিক প্রয়াস। কিছু প্রবীণমন্ত্রী এই কার্যকলাপগুলিকে কোনো নির্দিষ্ট অভিপ্রায় নিয়ে নয় যে যার মতো স্বাধীনভাবেই ঘটে গেছে বলেই ঘোষণা করছেন। সেক্ষেত্রে তো অত্যন্ত অভিজ্ঞতাহীনতার পরিচয় বলে গণ্য হবে। এটা সত্যি হলে মোদীর সরকার ও সঙ্ঘের সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলি যদি যে যার মতো করে যা কিছু বলে বা করে যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে প্রশাসনের সব দিকে তীক্ষ্ণ নজর দেওয়া ও তাৎকালীন ব্যবস্থা নেওয়ার যে সুনাম নিয়ে সরকার শুরু করেছিল সেই মূলগত ধারণাতেই প্রবল ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা। এখনও সময় রয়েছে ক্ষতিকারক দিকগুলিকে আয়ত্তের মধ্যে আনার। দেশের বাইরের উদাহরণ টেনে ভাবতে ভাল লাগে যে ভারত কি ইতালির পন্থা অনুকরণ করে প্রশাসন ও রাজনীতিকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না? হায়! তা যদি হোত সেক্ষেত্রে উন্নয়নের যে চারাগাছগুলি নিশ্চিতভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছে তারা বিপুল সম্ভাবনাময় হয়ে সহজেই বনস্পত্তির আকার নিতে পারত। কিন্তু ভারত ইতালি হতে পারবে না। তাই প্রধানমন্ত্রীকে একান্তভাবেই ভারতের রাজনৈতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রটিকে রাজনীতি, অর্থনীতি সমাজনীতি, জাতপাত প্রভৃতির সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়েই সামলাতে হবে।

(এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আধিকারিক ও অর্থনীতিবিদ)

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

শূর্পণখা লক্ষ্মণকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল মাত্র। এতে অপরাধ কোথায়? একজন নারী তার পছন্দের পুরুষকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। পত্নীনিষ্ঠ লক্ষ্মণ এতে বেজায় চটে গিয়ে শূর্পণখার নাক-কান কেটে দিলেন। ব্যস, লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে গেল। কী দরকার ছিল? ভাই লক্ষ্মণ, তুমি যদি এতই পত্নীনিষ্ঠ, তবে স্বামীসঙ্গতৃষাতুরা বালিকা বধূ ঊর্মিলাকে অশ্রুজলে ভাসিয়ে রামচন্দ্রের পিছন-পিছন চলে এলে কেন? যাক, সেকথা। আজ আর এক নাসিকা-ছেদনের কাহিনি বলব। তা শূর্পণখা-কাহিনি অপেক্ষা অনেক ভালো। তবু এ নিয়ে আর একটি রামায়ণ রচনা করা হলো না— কেন জানেন? কারণ এতে কোনো নারীর শুকচঞ্চুবৎ নাসিকা ছিল না। তাছাড়া, এখন দ্বিতীয় বাল্মীকি পাবেন কোথায়? আর একটি কথা বলে গৌরচন্দ্রিকা শেষ করব। পাঠক অবশ্যই জানেন, এক ইংরেজি-শিক্ষিত, ইংরেজ-দীক্ষিত নব্য-বঙ্গীয় যুবক একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গীতাগ্রন্থের খুব সুখ্যাতি করতে লাগলেন। ঠাকুর একটু মুচকি হেসে বললেন,— 'শালা, কোনো সাহেব বলেচে বুঝি।' যাই হোক, সাহেবদের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও অগাধ বিশ্বাস আমাদের অনন্তকাল ধরে থাকুক। কারণ সেই বিশ্বাসের বলেই এই কাহিনিটি প্রকাশ করছি।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে। হায়দার আলি তখন মহীশূরের রাজা। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর অহরহ যুদ্ধ চলছে। এমনই এক যুদ্ধের কথা কর্নেল কূট নামে এক ইংরেজ সেনাপতির ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ আছে। সে বেচারা হায়দার আলির সৈন্যবাহিনীর উপর অকস্মাৎ অকারণে চড়াও হয়ে কেল্লাফতে করতে চেয়েছিল। ভেবেছিল, স্বভাব-ভীরু ভারতীয় পল্টন গোরা-সৈন্য দেখেই পালাবে। কিন্তু বিধি বাম। কর্নেল কূট পরাজিত হয়ে বন্দী অবস্থায় হায়দার আলির রাজসভায় নীত হলেন।

কর্নেল কূট তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন— ''আমি হায়দারের বাহিনীর হস্তে পরাজিত হলাম। তাঁর সৈন্যসামন্ত আমাকে বন্দী করে তাদের রাজার নিকট নিয়ে গেল। তিনি শাস্তিস্বরূপ আমার নাক কেটে দেন। আমি সেই অবস্থার ঘুরতে ঘুরতে বেলগাঁও পৌঁছালাম। এক বৈদ্য বিস্মিত হয়ে আমার দুরবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলে বললাম— পাহাড়ে ধাক্কা লেগে আমার নাকের এই অবস্থা হয়েছে। বৈদ্যবর সেকথা বিশ্বাস করলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁকে সত্য ঘটনা বললাম। বৈদ্যরাজ জানতে চাইলেন, এর পর আমি কী করব। বললাম, ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়া ব্যতীত উপায় নেই। বৈদ্যরাজ বললেন, তিনি শল্যচিকিৎসা করে আমার নাক জুড়ে দিবেন। আমি সেকথা বিশ্বাস করিনি। তবু উপায়ান্তর না থাকায় তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলাম এবং তাঁর গৃহে চিকিৎসার জন্য চলে গেলাম। সেখানেই তিনি আমার নাক অপারেশন করেন এবং তা সফল হয়েছিল। তিনি একটি মলম দিয়ে প্রতিদিন ক্ষতস্থানে লাগাতে বলেছিলেন। পনেরোদিন পরে আমার নাক পূর্ববৎ হয়েছিল। আমি লন্ডনে চলে গিয়েছিলাম।''

কর্নেল কূট সেই অপারেশনের বিবরণ ত্রিশ পৃষ্ঠা জুড়ে তাঁর ডায়েরিতে লিখে গেছেন। এই ঘটনার তিন মাস পরে কূট বৃটিশ পার্লামেন্টে এই বিষয়ে একটি বক্তব্য রাখেন। ভাষণের প্রারম্ভে তিনি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্ন করেছিলেন— 'আপনারা কি বিশ্বাস করেন আমার এই নাকটি কাটা গিয়েছিল'? সমস্ত শ্রোতা সেদিন একবাক্যে বলেছিলেন— 'না'। অনন্তর তিনি সব ঘটনা পার্লামেন্টে সবিস্তারে বর্ণনা করে বললেন যে, ভারতীয় বৈদ্যগণ ওষুধপথ্য ও শল্যচিকিৎসায় এতই দক্ষ যে তারা শুধু প্লাস্টিক সার্জারি নয়; যে কোনো

প্রকার সার্জারি সব করতে সক্ষম। পার্লামেন্টের সদস্যগণ সেদিন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর ভাষণে মুগ্ধ হয়ে ইংল্যান্ড হতে একদল প্রতিনিধি ভারতে এসেছিলেন। সেই দলে কয়েকজন চিকিৎসকও ছিলেন। তাঁরা সেই বৈদ্যরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৈদ্যরাজের মুখে তাঁরা এই কথা শুনে বিস্মিত হলেন যে, ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামের গুরুকুলে এইরকম উচ্চস্তরের সার্জারি শিক্ষা দেওয়া হয়। সেইকথা শুনে প্রতিনিধি দলের কয়েকজন প্লাস্টিক-সার্জারি শিক্ষার জন্য একটি গ্রামের গুরুকুল বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। শিক্ষান্তে তাঁরা ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে অধীত বিদ্যা অনুশীলন করতে লাগলেন। তাঁরা সকলেই তাঁদের ডায়েরিতে প্লাস্টিক সার্জারির কলাকৌশল লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের একজনের ডায়েরি থেকে জানা যায় যে, তিনি যে গুরুদেবের নিকট প্লাস্টিক সার্জারি শিখেছিলেন, তিনি নাপিতকুলজাত ছিলেন। এতে বোঝা যায়, বিদ্যাশিক্ষায় কোনো জাত-পাত বিচার করা হোত না। গুরুকুলে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো জাতপাতের বাধা ছিল না। যে কোনো জাতের বিদ্যার্থী বিদ্যালাভের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পেত। জাত-পাতের ভিত্তিতে কোনো বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেত না। এটাই সচেতন ভারতের শিক্ষার মহান ঐতিহ্য। আর আজ!

অপর একজন ইংরেজ বিদ্যার্থী তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন যে, তাঁর গুরুও ছিলেন নাপিতকুলসম্ভূত। তিনি তাঁকে হতে-কলমে প্লাস্টিক-সার্জারি শিখিয়েছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে । এক মারাঠা সৈনিক একদিন তার দু'টি ছিন্ন হস্ত নিয়ে গুরুদেবের কাছে এসে হাত দু'টি জুড়ে দেবার জন্য অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন। গুরুদেব সেই ইংরেজ বিদ্যার্থীকে সেই ছিন্ন হাত দু'টো জুড়ে দিতে বললেন। তিনি সেই কাজ গুরুর তত্ত্বাবধানে নিজ হাতে সুসম্পন্ন করেছিলেন। সেই ইংরেজ বিদ্যার্থী হলেন— টমাস ক্রুশো। তিনি আরও লিখেছেন যে, তাঁর গুরু তাঁকে এই প্লাস্টিক সার্জারি শিক্ষা দিবার বিনিময়ে এক পয়সাও গ্রহণ করেননি। আজ ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মূলমন্ত্র হলো— 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল।' একেই বলে বেনের জাত! বিদ্যা নিয়েও ব্যবসা! আর আমাদের গুরুকুলে কোন প্রাচীনকালে বলা হয়েছে— 'নাহং বিদ্যা বিক্রয়ং করিষ্যামি।' বিদ্যা বিক্রয় করব না। কারণ এটা পণ্য নয়। যাহোক, টমাস ক্রুশো ইংল্যান্ডে ফিরে গেলেন। সেখানে একটি প্লাস্টিক সার্জারি শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করলেন। বহু ছাত্রকে তিনি সেই বিদ্যা শিখিয়েছিলেন। তবে সেই শিক্ষা-কেন্দ্রটি আদৌ 'বিদ্যা-বিপণি' ছিল কিনা তা লিখে যাননি। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস হলো এই যে, আমরা টমাস ক্রুশোর সার্জারি স্কুলের সাতকাহন মুখস্থ করছি। কিন্তু যেসব ভারতীয় বৈদ্যদের পদতলে বসে টমাস ক্রুশো ও তাঁর সতীর্থরা এই মহতি বিদ্যা অর্জন করেছিলেন, তাঁদের নাম জানবার চেষ্টা করিনি। আরও আশ্চর্যের বিষয়, টমাস ক্রুশোরা যে বৈদ্যগুরুদের পদতলে বসে এমন অদ্ভুত বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন, তাঁদের জাতির কথা উল্লেখ করলেন; কিন্তু তাঁদের নামধাম-পরিচয় লিখতে ভুলে গেলেন। এটাই বেনের জাতের বৈশিষ্ট্য। তাই সমস্ত বিশ্ব আজও সেসব মহান, উদার, নির্লোভ, নিরহঙ্কারী বৈদ্যগণের মানব চিকিৎসাশাস্ত্রে বিপুল অবদানের কথা জানেই না।

হে পাঠক! এই ঘটনা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। তবে যদি এই অধমের পরামর্শ গ্রহণ করেন, বলব—'সাহেবে যখন কইত্যাসে, তখন বিশ্বাস করাই বুদ্ধিমানের কাম হইব, হ।' ▮

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71,
Park Street, Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website :
www.calcuttawaterproofing.com

গো-বলয় ও বাঙালি

প্রবাল চক্রবর্তী

এই 'গো-বলয়' ব্যাপারটা কী বলুন তো? শব্দটা প্রায়শই দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রগুলোতে। কিন্তু কেউই ঠিক করে বুঝিয়ে দেয় না, শব্দটার মানে কী। কারা থাকে এই গো-বলয়ে? যারা গোরুর দুধ খায়, তারা? কিন্তু সেতো পৃথিবীশুদ্ধু সবাই খায়। তবে কি যারা গোরুপুজো করে, তারা? তামিলদের প্রধান উৎসব পোঙ্গল বস্তুত গোপূজা। তার মানে

তামিলনাড়ু গো-বলয়ের অন্তর্ভুক্ত? ও, তাও নয়? তবে কারা থাকে এই গো-বলয়ে? যারা গোরুকে 'মা' বলে? সাড়ে চুয়াত্তর সিনেমায় মলিনাদেবী বাড়ির গোরুটাকে মা বলে ডাকতেন। গ্রামবাংলায় এই পরম্পরা আজও দেখা যায়। তার মানে বাংলা গো-বলয়ের অঙ্গ, ঠিক কিনা?

ঠিক নয়? সেকি! তাহলে কারা থাকে গো-বলয়ে? যারা গোরক্ষা, গোহত্যা— এই ব্যাপারগুলো নিয়ে মাথা ঘামায়, তারা? মহারাজ গৌরগোবিন্দ শ্রীহট্টের শাসক ছিলেন। রাজ্যের আইন লঙ্ঘন করে এক মুসলমান নাগরিক গোহত্যা করেছিল। গৌরগোবিন্দ তাকে রাজ্যের আইন অনুসারেই প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। বদলা নিতে ইয়েমেনের সুফি পীর শাহজালালের নেতৃত্বে দিল্লী থেকে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী শ্রীহট্ট আক্রমণ করেছিল। ভয়ঙ্কর লড়াই হয়েছিল। বারবার আক্রমণের পরও বীর মহারাজ গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করতে পারেনি দিল্লীর সেনা। শেষমেশ শোনা যায়, পীর শাহজালাল 'জাদু' দ্বারা গৌরগোবিন্দকে হত্যা করে। হিন্দুহন্তা সেই পীরের নামেই ঢাকা বিমানবন্দরের নাম 'হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর'। গোরক্ষা-গোহত্যা নিয়ে বাঙালি মাথা ঘামায় না, এটা বোধহয় ঠিক নয়।

একটা অদ্ভুত ঘটনা শুরু হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়, সেটার কথা বলি। সুপার মার্কেট থেকে বেবি ফুড বেমালুম উধাও হয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে অনেক সুপার মার্কেটে নিয়ম করেছে, মাথাপিছু একটার বেশি বেবি ফুডের টিন কেনা যাবে না। কিন্তু একটা টিনে কতদিন চলে? সেই টিন ফুরোবার আগে আরেকটা কেনা যাবে, তার গ্যারান্টি কই? আমার সহকর্মী মিলোরাডের ছেলের বয়স ছ'মাস। ছেলের জন্য বেবিফুড জোগাড় ওর বড় সমস্যা। যখনই খবর পায় কোনো সুপার মার্কেটে বেবিফুড এসেছে, অফিসের কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে দৌড়োয় বেবিফুড কিনতে। চার-পাঁচজন প্রত্যেকে একটা করে কিনলে বেশ ক'দিন নিশ্চিন্ত। অস্ট্রেলিয়া এ যুগের দুধ-মধুর দেশ, আর এদেশের বাচ্চাদেরই দুধ জুটছে না? কেন হচ্ছে এরকমটা? এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হচ্ছে এখানকার খবরের কাগজে। শোনা যাচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী চীনারা নাকি বেবিফুড কিনে ক্যুরিয়ার করে চীনে পাঠাচ্ছে। চীনে নাকি বেবিফুডের এতটাই আকাল। তিনগুণ দাম দিয়ে, ক্যুরিয়ারের খরচ মিটিয়েও চীনা বাবা-মায়েরা বাচ্চাদের জন্য অস্ট্রেলিয়ান বেবিফুড কিনছে। আজ থেকে নয়, দীর্ঘদিন ধরেই চীনে জনসংখ্যার অনুপাতে দুগ্ধদায়ী গাভীর সংখ্যা কমেছে। কমিউনিস্ট শাসকরা গাভী সংখ্যা বাড়ানোর দিকে নজর না দিয়ে 'সিন্থেটিক মিল্ক' তৈরির দিকে নজর দিয়েছিল। সেই কৃত্রিম দুধ খেয়ে

অসংখ্য শিশু মারা গেছে, বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে আরো অনেক গুণ। সন্তানের প্রাণের চেয়ে দামি তো আর কিছু নেই, তাই চীনারা যেকোনো দামে অস্ট্রেলিয়া থেকে বেবিফুড কিনছে। এখানেই প্রশ্ন, ভারতবর্ষের এরকম অবস্থা হলো না কেন? উত্তরটা অনেকেরই পছন্দ হবে না। আয়তনে তুলনামূলকভাবে ছোটো ভূখণ্ড, প্রায় সমান জনসংখ্যা আর তুলনীয় সমাজ রচনা হওয়া সত্ত্বেও ভারতে দুধের এমন আকাল পড়েনি, যা চীনে হয়েছে। তার কারণ, ভারতীয়দের গোরক্ষা-গোহত্যা নিয়ে এই তথাকথিত 'কুসংস্কার'!

অস্ট্রেলিয়ায় ফ্রিওয়ে দিয়ে ড্রাইভ করে যেতে যেতে প্রায়শই নজরে পড়ে বিশাল সব খামার আর গো-চারণ ভূমি। সেসব খামার মাংসের জোগান মিটিয়েও দেশের বাচ্চাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ জোগান দেয়। কারণ, দেশটা বিশাল, তুলনায় জনসংখ্যা নগণ্য। ভারতে সে পরিস্থিতি নেই। সেখানে চাষের জমিই জোটে না, গোরুর খামার কোথা থেকে বানাবে? সেখানে গোরু গৃহপালিত, খামার-পালিত নয়। সেটাই বাঁচোয়া, অন্তত দেশের বাচ্চারা দুধ পেয়ে বাঁচে।

ভারতে গোমাংস এত সস্তা কী করে হয়? অস্ট্রেলিয়া সহ সারা পৃথিবীতে গোমাংস অন্য সব মাংসের থেকে প্রায় দ্বিগুণ দামি। কারণ মুরগি, ভেড়া বা ছাগলের তুলনায় গোরুর অনেক বড় চারণভূমি দরকার হয়। ভারতে যেসব গোরু কসাইখানায় দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই গৃহস্থের গোয়াল থেকে চুরি করা গোরু। না হলে দামে এত সস্তা হতে পারে না। যারা গোমাংস খাওয়ার অধিকারের কথা বলছেন, তারা কি এটুকু গ্যারান্টি দিতে পারবেন যে, কসাইখানার গোরুগুলো চোরাই গোরু নয়? নাকি তারা চুরির অধিকারকেও প্রতিষ্ঠা দিতে চাইছেন?

গোমাংস খাওয়াকে কি 'খাদ্যরুচির অধিকার' বলা যায়? আমাদের বাড়িতে ভাইফোঁটায় কচ্ছপের মাংস রান্না হওয়া ছিল পারিবারিক প্রথা, এ প্রথা আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। সেই কচ্ছপের মাংস একদিন নিষিদ্ধ হয়ে গেল। বড় ধাক্কা লেগেছিল আমার ঠাকুরমার মনে। ভাইফোঁটার রান্না করাই ছেড়েদিলেন সেই থেকে। তখন কাউকে দেখিনি, ধর্মতলার মোড়ে কচ্ছপের মাংস খেয়ে সত্যাগ্রহ করতে। সবাই মেনে নিয়েছিল, কচ্ছপ-প্রজাতির স্বার্থেই।

শুনেছি, আরবে কেউ ঘোড়ার মাংস খায় না। ইউরোপে খায় না কুকুরের মাংস। বস্তুত পাশ্চাত্যের প্রায় সব দেশেই সারমেয়-হত্যা নরহত্যার মতোই ঘৃণ্য। চীনে ইউলিন উৎসবে যখন হাজারে হাজারে কুকুর কেটে খাচ্ছে চীনারা, অস্ট্রেলিয়ায় খবরের কাগজ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সে নিয়ে কত লেখালেখি, কত প্রতিবাদ। এ দেশে কোনো প্রতিবেশী যদি কোনো গৃহস্থের কুকুর চুরি করে কেটে খায়, তবে অস্ট্রেলিয়ানরা সে প্রতিবেশীর ঘরদোর জ্বালিয়ে তাকে দেশছাড়া করে ছাড়লে অবাক হব না। কারণ, কুকুর এদেশে পরিবারের সদস্য হিসেবে সম্মান পায়। ঠিক যেমন গ্রামীণ ভারতে গোয়ালের গোরুটি পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সবার ভালবাসার অধিকারী। তাহলে হিন্দুরা গোহত্যা নিয়ে মাথা ঘামালে এত সমালোচনা হয় কেন?

প্রতি বছর দীপাবলীর আগে ভারতের টিভিতে আর খবরের কাগজে পরিবেশবিদরা মড়াকান্না লাগিয়ে দেন, দীপাবলীর বাজি পোড়ানোতে নাকি লক্ষ লক্ষ পশুপক্ষীর প্রাণহানি হচ্ছে। ভালো কথা। হিন্দুরা সকল জীবের বাঁচার অধিকারে বিশ্বাসী। এ পৃথিবীতে প্রথম পশু-হাসপাতাল হিন্দুরাই বানিয়েছিল। কিন্তু যখন ঈদের কোরবানিতে লক্ষ লক্ষ গোরুর প্রাণহানি ঘটে, তখন কেন এই তথাকথিত পরিবেশবিদরা সরব হন না? তাঁদের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ জাগে তখন।

নাদির শাহ-র দিল্লী আক্রমণের সময় আক্রমণকারী সৈন্যরা এত গোরু লুঠ করে কেটে খেয়েছিল, দিল্লীতে বাচ্চাদের জন্য দুধের আকাল পড়ে গিয়েছিল। সে সময় মুসলমান সমাজ থেকেই গোহত্যা বন্ধ করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাটা লিখে রেখে গেছেন তাঁর 'লুৎফ-উল্লা' উপন্যাসে। হালে দাদরি-কাণ্ড নিয়ে পাকিস্তানি নিউজ চ্যানেলগুলো যখন সরগরম, সে দেশের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী হাসান নিসার গ্রামীণ পাকিস্তানে ঘুঁটের ব্যবহারের নজির টেনে গোহত্যার বিপক্ষেই যুক্তি রেখেছেন। বস্তুত গোহত্যাকে মুসলমান ধর্মীয় অধিকারের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা ধান্দাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। ঈদের কোরবানিতে ভেড়া জবাই প্রথা, অন্যথায় উঠ। গোরু জবাই কবে থেকে ধর্মীয় অধিকার হলো? নাকি, এটা শুধু হিন্দুদের অপমান করার জন্য? তাদের ডেকে বলার জন্য, এই দেখ, তোদের দেশে আমরা এইসব করছি, তোদের কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তোরা বুড়ো আঙুল চোষা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছিস না। তোরা দুর্বল, ভীতু, নপুংসক। হিন্দুদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার এর থেকে ভালো উপায় কী আর কিছু আছে? বাংলাদেশে কথায় বলে, হিন্দু যখন ধর্মান্তরিত হয়, গোরু খাওয়ার যম হয়। সে দেশের প্রখ্যাত লেখক হুমায়ুন আহমেদ তাঁর লেখায় কয়েক জায়গায় এই বিকৃত মানসিকতার উল্লেখ করেছেন।

অবোধের (নাকি সুবোধের?) গোবোধে আনন্দ। এতসব তথ্য চোখের ওপর থাকা সত্ত্বেও কিছু বুদ্ধিজীবী গোমাংস খেয়ে সত্যাগ্রহ করছেন। আমার কিছু প্রশ্ন আছে তাঁদের কাছে। আজ যদি ভারতেও যথেচ্ছ গোমাংস খাওয়া শুরু হয়, তবে দেশটার হাল আপনাদের ওই বিপ্লবের জ্যাঠাভূমি চীনের মতো হবে না তো? ভাবী প্রজন্মের বেবিফুড নিশ্চিত করার জন্য আপনাদের কী নিদান? জানি, আপনাদের কাছে কোনো নিদান, কোনো সমাধান নেই।

এতসব ভেবে তো আপনারা গোমাংস সত্যাগ্রহ করেন না। বস্তুত, ভাবনা-চিন্তা ব্যাপারটাই তো আপনারা ছেড়ে দিয়েছেন অনেককাল আগে। স্বাধীন ভাবনা-চিন্তা আর ল্যাপডান্স কি একসঙ্গে চলে? আপনারা তো শুধু কোলে চড়ে নাচতে পারেন। কখনো স্ট্যালিনের কোলে, কখনো নেহরুর কোলে, কখনো মাওয়ের কোলে, কখনো বা মওদুদির কোলে আপনারা শুধু নেচেই চলেছেন। স্বাধীন ভাবনা-চিন্তা তো আপনাদের শুধু অ্যাকটিং-অ্যাকটিং।

(লেখক মেলবোর্নের প্রবাসী ভারতীয়)

খালি পায়ে দৌড়ে সোনা জয় সয়ালির

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রতিবন্ধকতা বা দারিদ্র্য প্রতিভার কাছে হার মানতে বাধ্য। অদম্য সাহস এবং ইচ্ছাশক্তির কাছেও পিছু হঠতে বাধ্য যেকোনোরকম বাধা। কারণ লক্ষ্য যদি স্থির হয় তাহলে সমস্ত বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে সফল হওয়া সম্ভব। সেই কাজই করে দেখিয়েছে ১৪ বছরের সয়ালি মাহিশুনে। কোনো বাধাই তাকে চার- দেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখতে পারেনি। বরং অভাব অনটনকে তুচ্ছ মনে করে সামনের দিকে এগোতে সক্ষম হয়েছে সে।

মুম্বইয়ের ঘিঞ্জি বস্তিতে বাস মাহিশুনে পরিবারের। তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী চরম দারিদ্র্য। এই পরিবেশ থেকেই উঠে এসেছে ছোট্ট মেয়েটি। সয়ালির বাবা মঙ্গেশ মাহিশুনে পেশায় একজন চর্মকার। মুম্বইয়ের দাদরিতে রাস্তার ফুটপাতে বসে জুতো সেলাই করেন তিনি। সেখান থেকে মাসিক ৫-৬ হাজার টাকা যা আয় হয় তা দিয়েই চারজনের সংসার চালাতে হয় তাঁকে। ছোট মেয়ে সয়ালির কোনো দৌড় প্রতিযোগিতা থাকলে তাও দেখতে যাওয়ার উপায় নেই। বড় মেয়ে ময়ূরী এবং স্ত্রী দেখতে গেলেও রুটিরুজির জন্য তাঁর সে সুযোগ হয় না। এরকমই এক টুর্নামেন্ট হয়েছিল মুম্বইয়ের প্রিয়দর্শিনী পার্কে। জেলা ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আন্তঃ বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপে বড় মেয়ে ও স্ত্রী উপস্থিত থাকলেও মঙ্গেশ থাকতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি যেতে চাইলেও যেতে পারি না। কারণ সয়ালির দৌড় দেখার চেয়ে তাঁদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার দায়িত্ব বেশি। তাই ইচ্ছা থাকলেও দেখতে যেতে পারি না।' মূলত চারজনের দুবেলা দুমুঠো খাওয়ার জোগাড় করার দায়িত্ব যেমন, তেমনই তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দায়িত্বও তাঁর। যত দিন যাচ্ছে ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে পড়ছেন সয়ালি-ময়ূরীর মা। তাই বাবার আয়ের বেশিরভাগটাই ব্যয় হয় তাদের মায়ের চিকিৎসার জন্যে।

সয়ালি মাহিশুনে বর্তমানে আর এম ভাট উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের একজন প্রথম সারির রানার্সও। সয়ালির দিদি ময়ূরীও তথ্যপ্রযুক্তিতে ডিপ্লোমা করছে। কিন্তু সংসার সামলে মেয়েদের ইচ্ছা পূরণে হাঁফিয়ে উঠছেন মঙ্গেশ। এমনকী সয়ালির ট্র্যাকে দৌড়ানোর জন্য যে বিশেষ জুতোর প্রয়োজন তাও কিনে উঠতে পারেননি তিনি। কারণ ১৪০০ টাকা দামের বিশেষ জুতো কেনা একজন চর্মকারের পক্ষে সম্ভব নয়। সেকথা ভেবে খালি পায়েই দৌড়য় সয়ালি। আর এই খালি পায়ে দৌড়েই সোনা জিতেছে ১৪ বছরের এই তনয়া। মুম্বইয়ের প্রচণ্ড গরমে মাটিতে পা রাখলে পায়ের পাতা পুড়ে যাবার উপক্রম। কিন্তু তা সত্ত্বেও খালি পায়ে দৌড়ে সফল সে। এ প্রসঙ্গে সয়ালি জানায়, 'আমি আগাগোড়াই খালি পায়ে দৌড়নো প্র্যাকটিস করি। কারণ আমার বাবার পক্ষে এই জুতো কিনে দেওয়া সম্ভব নয়।" তবে তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রয়াত বিজেপি নেতা প্রমোদ মহাজনের কন্যা পুনম মহাজন। পুনম তাকে একজোড়া জুতো উপহার দিয়ে বলেছেন, 'কোনো ছেলেমেয়ে যেন তাদের স্বপ্নকে বিসর্জন না দেয়। আমি তাদের সর্বসম্মতভাবে সাহায্য করতে চাই যাতে তারা ভবিষ্যতে সফল হতে পারে।' সয়ালি প্রতিবার ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণ করে। এখান থেকে যে টাকা সে পায় তা বাবার হাতে তুলে দিয়ে তাঁর কষ্ট কিছুটা লাঘব করতে চায়।

সয়ালি মাত্র ১৪ বছর বয়সে ১২ মিনিট ২৭ সেকেন্ডে ৩ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা জিতে অবাক করে দিয়েছে সকলকে। তাই একবাক্যে সকলে স্বীকার করেন আগামী দিনে সয়ালিই পারবে বিশ্বদরবারে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করতে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

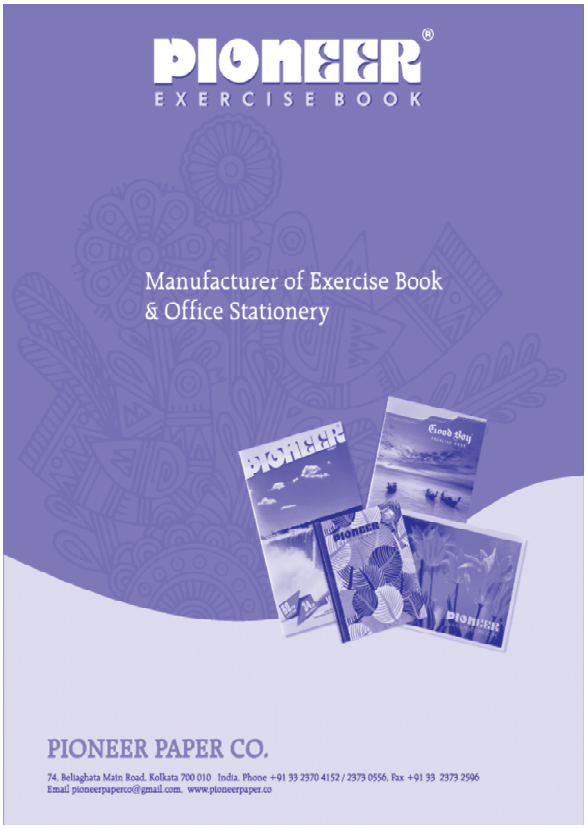

‘আমরা আরও জানি যে শিক্ষা, যত সামান্যই হোক না কেন, সমাজের সর্বস্তরে প্রসারিত করতে হবে, একেবারে নিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত। কারিগরী শিক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয়ে উচ্চতর গবেষণারও আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কারণ, উচ্চতর গবেষণা ছাড়া কারিগরী শিক্ষা যেন মূলবিহীন বৃক্ষ এবং বৃন্তহীন পুষ্পের মতো নিরর্থক।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

মহামতি চাণক্যই অর্থশাস্ত্রের উদ্‌গাতা

পুস্তক প্রসঙ্গ

অম্লানকুসুম ঘোষ

খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব থেকেই সমগ্র বিশ্বে আন্তর্মহাদেশীয় বাণিজ্য প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে গোটা বিশ্বের বুদ্ধিজীবী-মহল মনে করে যে অর্থনীতি পাশ্চাত্যেরই দান। জ্ঞানচক্ষু নিমীলিত রেখে এরূপ অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হওয়ার কারণ একটাই 'সাহেব বাক্য প্রমাণম্'। কিন্তু সেই অন্ধবিশ্বাস দূরে সরিয়ে রেখে যুক্তির ও জ্ঞানের আলোয় চক্ষু উন্মীলন করলে দেখা যাবে যে অর্থশাস্ত্র ভারতবর্ষেরই দান। প্রাচীন ভারত সারা বিশ্বকে যেমন গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে, তেমনই অর্থনীতির প্রাথমিক পাঠও সমগ্র বিশ্ব ভারতের থেকেই পেয়েছে। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের গুরু এবং রাজনির্মাতা তথা প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, কৌটিল্য নামেই সমধিক পরিচিত মহামতি চাণক্যই এই শাস্ত্রের উদগাতা। আধুনিক পৃথিবীতে ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের হাতে আন্তর্মহাদেশীও বাণিজ্য নতুন মাত্রা পাওয়ার আগে অবধি পৃথিবীতে অর্থসম্বন্ধীয় কার্যসমূহ কৌটিল্যের নীতি অনুসারেই পরিচালিত হোত। মধ্যযুগে মধ্যএশিয়া ও উত্তর ইউরোপ থেকে শুরু হওয়া বর্বর আক্রমণ সারা বিশ্বকে কম্পিত করার সময় তৎকালীন অর্থনীতি অর্থাৎ কৌটিল্যের অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর কয়েক শতাব্দী পরে মহাদেশসমূহের মধ্যে যোগাযোগের নতুন জলপথ আবিষ্কার হওয়ার পর বিশ্বের অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আসে। নতুন যোগাযোগ শুরু করে নতুন অর্থনীতির। এই সময় থেকেই শুরু হয় পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক অর্থনীতির। কৌটিল্য-প্রণীত ভারতীয় অর্থনীতি চলে যায় বিস্মরণের অতল গহ্বরে। সাধারণ মানুষ তো বটেই এমনকী গবেষকরাও কৌটিল্যের অর্থনীতি সম্বন্ধে হয়ে পড়েন অনবহিত। এই অবস্থা থেকে বহু শতাব্দীর বিস্মৃতির আবরণ সরিয়ে কৌটিল্যের অর্থনীতিকে আধুনিক মানুষের সামনে উপস্থিত করেছেন রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র : হিন্দু অর্থনীতির প্রস্তাবনা' নামক গ্রন্থটিতে। আধুনিক অর্থনীতির সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন। বিশ্লেষণ-সমৃদ্ধ এই বইটি তাই অবশ্যপাঠ্য। লেখক সোলনের অর্থনীতির সঙ্গে তুলনা করে কৌটিল্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এমনকী বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত তথাকথিত কল্যাণ অর্থনীতি মার্কসের অর্থনীতি বা মার্কসবাদের সঙ্গে কৌটিল্যের অর্থনীতির তুলনা করে লেখক

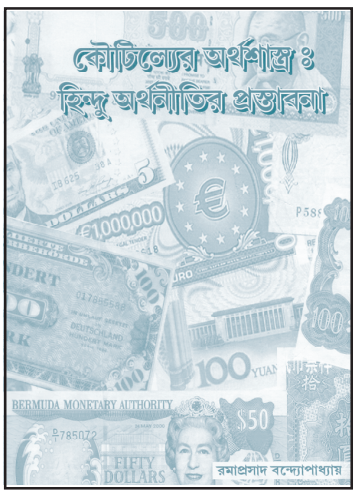

কৌটিল্যের অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং মার্কসবাদের অসারত্ব প্রমাণ করেছেন। বাজার অর্থনীতি বা মার্কসের অর্থনীতি উভয়ই অর্থনীতিতে দু'ভাগে ভাগ করে দেখে। বাজার অর্থনীতি বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিতে আর মার্কসের অর্থনীতি শ্রমিকের দৃষ্টিতে। বাজার অর্থনীতি চায় যে কোনো মূল্যে উৎপাদন বাড়াতে যাতে বিনিয়োগকারীর মুনাফা এবং তদনুযায়ী পুনর্বিনিয়োগ বাড়ে। এর ফলে উৎপাদন বেড়ে অর্থনীতির পালে নতুন হাওয়া লাগে কিন্তু শ্রমিকের প্রাপ্য মারা যায়। ফলে মানব-সম্পদের উন্নতি হয় না। আবার মার্কসের অর্থনীতি শ্রমিকের প্রাপ্যের ব্যাপারে যত্নবান কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে উদাসীন। তাই এতে মানবসম্পদের উন্নতির ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় কিন্তু উৎপাদন হ্রাস পেয়ে অর্থনীতি গতিমন্থরতায় ভোগে এবং উন্নত মানবসম্পদের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয় না। ফলস্বরূপ দেশ ও জাতি চোরাবালির ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। আবার ক্লাসিকাল ও কেইনসিয় অর্থনীতিও সামগ্রিক অর্থনীতিকে দু'ভাগে ভাগ করে দেখে। কেইনসিয় অর্থনীতি একজন ব্যক্তি উপভোক্তার দৃষ্টিতে সামগ্রিক অর্থনীতিকে দেখে। ক্লাসিকাল অর্থনীতি সমস্ত ব্যক্তি উপভোক্তার সমষ্টিগত ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করে সেই অনুযায়ী উৎপাদনকারীর ও বিপণনকারীর বর্তমান ক্রিয়া নির্ধারণ করে। উপরিউক্ত চার প্রকার অর্থনীতিই সামগ্রিক অর্থনীতিকে দু'ভাগে ভাগ করে দেখে বলে এরা অর্থনীতির সামগ্রিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়। কৌটিল্যের অর্থনীতি সামগ্রিক অর্থনীতিকে এক দৃষ্টিতে দেখে (যা প্রাচীন ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সমার্থক)। তাই শুধুমাত্র কৌটিল্যের অর্থনীতিই যে কোনো যুগে যে কোনো সময়ে যে কোনো দেশে যে কোনো অর্থনীতির যে কোনো সমস্যা সমাধানে সক্ষম। এই গ্রন্থ পাঠ করে পাঠক একটি বিষয়ে অবহিত হবেন তা হলো প্রাচীন ভারত অন্যান্য সব বিষয়ের মতো অর্থনীতিতেও জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল। সেই শ্রেষ্ঠত্ব কালস্রোতে আড়ালে গেলেও নিত্য সমুজ্জ্বল রয়েছে। বর্তমান ভারতকেও যদি তার অর্থনৈতিক দুরবস্থা কাটিয়ে উঠে নিজেকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে আমেরিকামুখী বা রাশিয়ামুখী বিদেশি অর্থনীতি নয়, নির্ভর করতে হবে ভারতে আবিষ্কৃত একমাত্র স্বদেশি অর্থনীতি কৌটিল্যের অর্থনীতির উপরেই।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র : হিন্দু অর্থনীতির প্রস্তাবনা। লেখক : রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যের পথ প্রকাশন, কলকাতা। মূল্য : ২০০ টাকা।

‘শ্রদ্ধা’র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

বীরভূম জেলার সিউড়ী নগরে গত ১২ ডিসেম্বর সহস্রাধিক পূর্ণচন্দ্র দর্শনকারী ৮৫ বৎসর বয়স্ক, বহু ব্যক্তিত্বের স্রষ্টা ও সম্মানিত আদর্শ শিক্ষক অজিত কুমার ভদ্রকে ‘শ্রদ্ধা’র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান অনুষ্ঠান তাঁরই সুভাষপল্লীস্থিত বাসগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের সূচনা তিনবার ‘ওঁ’ ধ্বনি ও মঙ্গলদীপ প্রজ্বলনের দ্বারা করা হয়।

মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক স্বামী সত্যানন্দপুরী মহারাজ। শ্রীভদ্র মহাশয়কে পা-হাত ধুইয়ে মালা ফুল চন্দন তুলসীপত্র দিয়ে পূজা করেন তাঁর পুত্রবধূ শ্রীমতী বিদ্যুৎপ্রভা ভদ্র। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী কাকলী দাস ও শ্রীমতী পুরবী চট্টোপাধ্যায়। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। মানপত্র পাঠ করেন শিশুমন্দিরের সভাপতি ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শান্তি কুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রীভদ্রকে বস্ত্র, উত্তরীয়, গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করা হয়।

ভদ্র পরিবারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন তার একমাত্র পুত্র অমিত ভদ্র। তাঁর প্রিয় ছাত্র, সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক বর্তমানে কল্যাণ আশ্রমের সম্পাদক বিশ্বনাথ দে মাস্টারমশাইয়ের ত্যাগব্রতী ও ছাত্রদরদী জীবন সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক, শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য। ভদ্রপরিবার ও উপস্থিত সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু।

সমাবেশ সমাচার

মঙ্গলনিধি

গত ১০ অগ্রহায়ণ, বারাসাত জেলার ব্যবস্থা প্রমুখ অরুণ কুমার দাস তাঁর কন্যা মৌমিতার শুভ পরিণয় উপলক্ষে বিবাহবাসরে বিভাগ সঙ্ঘচালক সুভাষ নন্দীর হাতে নবদম্পতি ও তার ধর্মপত্নী শ্রীমতী শান্তা দাস মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। সমবেত অতিথিদের সামনে মঙ্গলনিধির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ক্ষেত্রীয় সহ প্রচার প্রমুখ রমাপদ পাল।

***

মেদিনীপুর জেলার গড়বেতার স্বয়ংসেবক তারাচাঁদ দত্তের ভাইঝি প্রিয়ঙ্কা দত্তের শুভ বিবাহ উপলক্ষে বিবাবাসরে নব-দম্পতি মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক রঞ্জন ভুঁইয়ার হাতে। শ্রীভুঁইয়া জেলা প্রচারক কেদার মালের হাতে এই অর্থ জেলার সেবাকাজের জন্য তুলে দেন। অনুষ্ঠানে দক্ষিণবঙ্গের সহ সম্পর্ক প্রমুখ সুনীল ঘোষ-সহ বহু স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

ড. অরুণপ্রকাশ অবস্থীর জন্মদিনে কাব্য-আসর

প্রখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং জাতীয়তাবাদী কবি ড. অরুণপ্রকাশ অবস্থীর ৭৭তম জন্মদিনে কলকাতার শ্রীবড়বাজার কুমার সভা পুস্তকালয়ে তত্ত্বাবধানে এক কাব্য আলোচনার আসর বসে পুস্তকালয়ের সভাগৃহে। আসরে সভাপতিত্ব করেন পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কা ত্রিপাঠী। শুরুতে অবস্থীজীর গৌরবময় জীবন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন পুস্তকালয়ের সম্পাদক মহাবীর বাজাজ। অনুষ্ঠানে কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রভারতীর উদ্যোগে জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসব

আগামী ২৬ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ইন্দোরে জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসব (ন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল) হতে চলেছে। উদ্যোক্তা চিত্রভারতী। এই উৎসবে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি ও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হবে। প্রধানত পারিবারিক মূল্যবোধ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশ রক্ষাই হবে এই উৎসবের মূল ভাবনা। এই মর্মে বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তাদের শাখাগুলিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য, জেলা থেকে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি ও তথ্যচিত্র পাঠাতে বলা হয়েছে।

অভিনেতা অনুপম খের, পরেশ রাওয়াল, রঘুবীর যাদব, রাজপাল যাদব, সুকেশ তেওয়ারি ওই উৎসবে উপস্থিত থাকবেন এবং সেইসঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় যোগ দেবেন বলেও উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, হিন্দু জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত কয়েকজন ব্যক্তি এই সংস্থা গঠন করেছেন।

আর এস এসের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচার প্রমুখ জে নন্দকুমার ইন্দোরের দেবী অহল্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরে গত ৬ ডিসেম্বর চলচ্চিত্র সংগঠন সমিতির কার্যালয় উদ্বোধন করেন। ওয়েবসাইট— http : //www. chitrabhartifilmfest.com-এরও উদ্বোধন করা হয়।

বারাসতের স্বয়ংসেবকদের গঙ্গাসাগরে সাগর পূজা।

শোকসংবাদ

মালদা শহরের স্বয়ংসেবক বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরীর মাতৃদেবী আভারানী রায়চৌধুরী ৯৩ বছর বয়সে গত ১৫ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের তৃতীয় বোন শ্রীমতী মিনা কুণ্ডু (৭৬) দীর্ঘ এক বৎসর রোগভোগের পর গত ১৩ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন।

রঘুনাথগঞ্জে পরিবার প্রবোধনের সভা

গত ১৭ নভেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ নগরে পরিবার প্রবোধনের এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভানেত্রী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মণিমালা সরকার। শহরের বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে কুটুম্ব প্রবোধনের মাধ্যমে মায়েদের ভূমিকা, রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা, সংস্কারিত জীবন পদ্ধতির ওপরে বিস্তারিত আলোচনা করেন উত্তরবঙ্গ কুটুম্ব প্রবোধনের প্রান্ত প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল।

চেন্নাইয়ে বন্যায় স্বয়ংসেবকদের সেবাকাজ

* ৫৫০০ স্বয়ংসেবক ত্রাণসামগ্রী পৌছনোর কাজে রত।
* ১২ লক্ষের বেশি ভোজন প্যাকেট বিতরণ।
* ৫ লক্ষ রুটির প্যাকেট বিতরণ।
* ৫০ হাজার চাদর বিতরণ।
* ৩০ হাজার কম্বল, মোমবাতি, ওষুধ ও মহিলাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ।
* ৫০ জন ডাক্তার ও ১২ জন ডাক্তারি ছাত্র চিকিৎসার কাজে রত।

সন্ত সীতারামজী ভারত পরিক্রমায় বীরভূমের গ্রামে।

মঙ্গলনিধি

***

মালদহ জেলার পুরাতন মালদা নগরের স্বয়ংসেবক তথা কলেজছাত্র প্রমুখ রাণা দাসের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ উপলক্ষে গত ১২ অগ্রহায়ণ তার মা শ্রীমত্যা শিখা দাস মঙ্গলনিধি প্রদান করেন সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের হাতে।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা নগর কার্যবাহ সুদীপ দাসের শুভবিবাহ উপলক্ষে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে গত ৮ ডিসেম্বর তার বাবা-মা মঙ্গলনিধি অর্পণ করে প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

***

পুরাতন মালদা নগরের সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী সৌগত বাগচী গত ৯ ডিসেম্বর তাঁর শুভবিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের হাতে।

***

গত ১৫ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে নগর কার্যবাহ সুজয় দাসের পুত্রের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে উপলক্ষে তাঁর বাবা পবিত্র দাস, মা শ্রীমতী জয়া দাস ও ধর্মপত্নী পূজা দাস মঙ্গলনিধি প্রদান করেন বিভাগ সঙ্ঘচালক সুভাষ নন্দীর হাতে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

ক্রীড়া জগতের সুন্দরীরা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলার দুনিয়ায় পারফরমেন্সের পাশাপাশি সৌন্দর্য্যের দ্যুতি নিয়েও জনমানসে চিরস্থায়ী আসন লাভ করে নিয়েছেন বহু খ্যাতকীর্তি মহিলা ক্রীড়াবিদ অ্যাথলিট। ভারতেও এই ধরনের মহিলা পারফর্মারের সংখ্যা ইদানীংকালে অনেক বেড়ে গেছে। সারা ভাব তের মানুষ বিশেষ করে পুরুষদের হার্টথ্রব হয়ে উঠেছেন তাঁরা। এমনও হয়েছে যে, কোনো মহিলা খেলোয়াড়ের বিশেষ কোনো পোশাক বা অলঙ্কার 'সেনসেশন' তৈরি করে দিয়েছে সর্বত্র। বিপণন দুনিয়ায় সেই বস্তুটির উত্তুঙ্গ চাহিদা প্রমাণ করে সেই ক্রীড়াবিদের জনপ্রিয়তা। গ্ল্যামার, অনন্য স্টাইল, ভুবনমোহিনী রূপ নিয়ে তাঁরা রীতিমতো পাল্লা দিয়েছেন চলচ্চিত্রের অভিনেত্রীদের সঙ্গে। হয়ে উঠেছেন খেলার জগতে 'ফ্যাশন আইকন' এবং 'স্টেটমেন্ট'। এমনই কয়েকজন মহিলা ক্রীড়াবিদকে নিয়ে আলোচ্য প্রতিবেদন।

সানিয়া মির্জা— শুধুমাত্র একনম্বর সুন্দরী ভারতীয় ক্রীড়াবিদই নন, টেনিস সার্কিটে মহিলাদের ডাবলসে এই মুহূর্তে একনম্বর সুপারস্টার। এবছরই জিতছেন তিনটি গ্রান্ডস্লাম-সহ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপও। চোট-আঘাতে কাবু হয়ে না পড়লে সিঙ্গলসেও ডব্লুটিএ খেতাব বেশ কয়েকটি করায়ত্ত হোত। ট্রফি ক্যাবিনেট ভরে উঠত। বিনোদন দুনিয়ার বাইরে রূপবতী ভারতীয় খুঁজতে গেলে সবার আগে বেরিয়ে আসে তাঁর নামটি। সারা দেশের নবোদিত প্রজন্মের 'আইকন' সানিয়া। সব ক্ষেত্রের কর্মযোগী মহিলারা সানিয়ার খেলা ও ফ্যাশন ট্রেন্ডের অনেকে অনুপ্রাণিত হন। নিখুঁত কোরহ্যান্ড, ক্রস কোর্ট রিটার্ন, ভলির মতোই ড্রেস সেন্সও অসাধারণ সানিয়ার। মূলত রোহিত বল, রকি এস এবং সিমি চন্ডকের মতো ফ্যাশন ডিজাইনারের করা পোশাকে নিয়মিত র‍্যাম্পে ক্যাটওয়াক করতে দেখা যায় সানিয়াকে। ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্য ও ক্রীড়ানৈপুণ্যের মতোই দিগন্ত বিস্তৃত তাঁর জনপ্রিয়তা। যা মারিয়া শারাপোভার সঙ্গে তুলনীয়।

সাইনা নেওয়াল— টেনিসের সানিয়া মির্জার মতোই ব্যাডমিন্টনে সাইনা নেওয়াল। দুই হায়দরাবাদী কন্যার দাপট ও উজ্জ্বল্যে এবছর ভারত গর্ব করার মতো অনেক উপাদান খুঁজে পেয়েছে। সাইনাও বেশ কিছুদিন বিশ্ব র‍্যাঙ্কিয়ে একনম্বর স্থানে ছিলেন। ওয়ার্ল্ড অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স হয়েছেন। জিতেছেন তিনটি মাস্টার্স খেতাবও। দেশে-বিদেশে সারাবছর খেলে বেড়ানোর পাশাপাশি রূপচর্চাতেও সমান মনোযোগী ও পারদর্শী সাইনা। নিষ্প্রাণ সারল্যে ভরা সৌন্দর্য্য ও নিরামিক ফিগারের অধিকারিণী সাইনা দীর্ঘদিনই র‍্যাঙ্কের পরিচিত মুখ। সম্প্রতি হায়দরাবাদ ফ্যাশন উইকের প্রধান আকর্ষণ সাইনা কয়েক যোজন পিছনে ফেলে দিয়েছেন অন্যান্য মডেল সুন্দরীদের। 'বিউটি উইথ ব্রেন' এই নীতি কথাটিকে বাস্তবে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন সুন্দরী মেগাতারকা।

জ্বালা গুট্টা— সাতবারের জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন জ্বালা গুট্টার সুঠাম শরীরের জ্বালাময়ী আবেদনে চোখ ঝলসে ওঠে দর্শকদের। জ্বালা ও অশ্বিনী পোনাপ্পা জুটি বিশ্ব ব্যাডমিন্টন মঞ্চে ভারতকে তুলে ধরেন ২০১০-এ। সেবার তারা ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে। এরপর কমনওয়েলথ গেমস-সহ একাধিক বড়মানের প্রতিযোগিতায় এই জুটির সাফল্যের ধারাবাহিকতা অটুট ছিল।

সাইনা ও পিভি সিন্ধুর আগে আন্তর্জাতিক সার্কিটে ভারতীয় মহিলা ব্যাডমিন্টনের মুখ ছিলেন জ্বালা ও অশ্বিনী। পাশাপাশি সৌন্দর্য্য ও মোহিনী আবেদনের জন্যও দর্শক ও ভক্তচিত্তে আলোড়ন তুলেছেন জ্বালা।

তানিয়া সচদেব— উইমেন গ্রান্ডমাস্টার তানিয়া সচদেব বিশ্বদাবার কিংবদন্তী হাঙ্গেরির জুড়িথ পোলগারের ভারতীয় প্রতিচ্ছবি যেন। চিন্তাশীল বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি ছান্দসিক চারিত্রিক মাধুর্য ও সৌন্দর্য সহযোগে ইতিমধ্যেই ভারতীয় ক্রীড়া সমাজে অনন্য চরিত্র হয়ে উঠেছেন। ক্যাটওয়াকে তাঁর আবেদন সংবেদনশীল মানুষের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। অভাবনীয় গ্লামার ও বুদ্ধিদীপ্ত দু'টি চোখের আবেদনে 'উইলস লাইফ স্টাইল ইন্ডিয়া ফ্যাশন উইক'-এ বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন।

দীপিকা পাল্লিকল— স্কোয়াশের রানি দীপিকা কোর্ট ও কোর্টের বাইরে তাঁর নান্দনিক শৈলী ও আবেদনের জন্য যথেষ্ট বিখ্যাত। এশিয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বেশ কিছু সাফল্য করায়ত্ত হয়েছে। দীপিকা ও জ্যোৎস্না চিনাপ্পার দৌলতে অভিজাত সমাজের খেলা স্কোয়াশ ভারতে আমজনতার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। আবার ফ্যাশন শো, বিউটি প্রেজেন্ট প্রতিযোগিতাতেও দীপিকার আবেদন ক্রমবর্ধমান। ■

শব্দরূপ-৭৭২ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

■	১			■	২	৩	
৪		■	■	৫			■
৬					■	■	৭
৮		■	■	৯		১০	
১১			১২	■	■	১৩	
	■	■	১৪				
■	১৫	১৬		■	■	১৭	
১৮			■	১৯			■

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. বিরেচক ওষুধ, যা খেলে ভেদ বা দাস্ত হয়, **২.** জীবানানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ, 'বেলা — কালবেলা', **৪.** চাকার পাখি, **৫.** শোভাযাত্রা, **৬.** মসৃণ মাদুরবিশেষ, **৮.** '— থেকে তাল' (প্রবচন), **৯.** জাহাজের খালাসি, **১১.** বায়ু; গার্হপত্য অগ্নি, **১৩.** শত্রু; কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য, **১৪.** (বানানভেদে) মৃতব্যক্তির প্রতীকস্বরূপ কুমূর্তি; বিরোধীরা প্রায়শই সরকারের এটা পুড়িয়ে থাকে, **১৫.** আসল নয়, **১৭.** ঠোঁটের দুইপাশ, **১৮.** ইন্দ্রের সারথি, **১৯.** দেবরাজের সভাগৃহ।

উপর-নীচ : ১. সত্বর হাজির হওয়ার জন্য কড়া হুকুম, **২.** সম্পত্তি পরিচালক, **৩.** এটা পাকলে কাকের কী? **৪.** আশি কিংবা তার উপরে যার বয়স, **৫.** 'মা, আমার সাধ না—', **৭.** অধুনালুপ্ত ছোটদের মধ্যে প্রচলিত একটি খেলা; একে-দুয়ে তস্কর, **১০.** কৃতকর্মা; দক্ষ, **১২.** চতুর্থ পাণ্ডব; বেজি, **১৫.** 'আমার মাথা — করে দাও হে/তোমার চরণধূলির 'পরে', **১৬.** পদ্যের বা গানের পদ; পুরাণোক্ত চতুর্থ যুগ।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৬৯
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুমন মাহাতো
পুরুলিয়া

ধ	■	■	কাঁ	ই	না	না	■
নে	■	■	কা	■	ল	■	■
শ	ত	দ	ল	■	ক	ব	ন্ধ
■	র	■	■	■	■	র	■
■	মু	■	■	■	■	রু	■
ব	জ	রা	■	বি	সূ	চি	কা
■	■	য়	■	জ	■	■	লী
■	ভূ	ত	ব	লি	■	■	য়

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৭২ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৮ জানুয়ারি ২০১৬ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ১১

দেশের বিকাশের জন্য সামাজিক একতার প্রয়োজন : ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসের জন্মশতাব্দী উপলক্ষে গত ১৭ ডিসেম্বর আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বর্তমান সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত বলেন, দেশের বিকাশের জন্য সামাজিক একতার প্রয়োজন অনিবার্য। আলোচনা সভার আয়োজন করে মহারাষ্ট্রের নাগপুর নাগরিক সহকারি ব্যাঙ্ক। বিষয় ছিল 'সামাজিক সমরসতা'।

তিনি বলেন, আমাদের দেশে সমস্ত বিবিধতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চর্চা হয় জাতিব্যবস্থার। জাতিভেদের কারণে সমাজে সমস্যা নির্মাণ হয়। ফলে সংঘর্ষ হয়। সেজন্য সমাজে থেকে জাতিভেদ দূর করতে হবে। তার একমাত্র উপায় হলো সামাজিক সমরসতা। জাতিব্যবস্থাকে সঠিক দৃষ্টিতে দেখে ভেদভাব দূর করতে হবে। তিনি জোরের সঙ্গে জানান, সঙ্ঘ সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়; যতদিন সমাজে ভেদভাব থাকবে ততদিন এই ব্যবস্থা থাকা উচিত। সঙ্ঘ জাতপাতের ভিত্তিতে সংরক্ষণের পক্ষে নয়।

হিন্দুধর্মে সকল বিশ্বাসের স্থান আছে : সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হিন্দুধর্মের সম্পর্কে দেশের এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে ভুল ধারণা রয়েছে তা ভাঙতে চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, শতাব্দীর পর শতাব্দী অর্জিত জ্ঞান এবং অনুপ্রেরণা হলো হিন্দুধর্ম। গত ১৬ ডিসেম্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ও সুপ্রিম কোর্ট প্রদান করেছে। ওই রায়ে শীর্ষ আদালত বলেছে— রাজ্য সরকার কোনো মন্দিরে পুজারি নিয়োগের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যে কোনো হিন্দুই জাতপাত নির্বিশেষে পূজারি হতে পারেন। বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এবং এনভি রমণের বেঞ্চ বলেছে, ''হিন্দুধর্ম অন্য কোনো বিশ্বাসকে অপসারিত করে বা কোনোপ্রকার হুকুমনামা জারি না করেই নিজের অঙ্গীভূত করে নেয়।''

''এটা এমন একটা ধর্ম যার কোনো একজন প্রতিষ্ঠাতা, কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মশাস্ত্র এবং কোনো নির্দিষ্ট উপাসনা পদ্ধতি নেই। তাই একে সনাতন ধর্ম বা শাশ্বত ধর্ম বলা হয়ে থাকে। শত শত বছরের চিরন্তন বিশ্বাস যা সমষ্টিগত জ্ঞান এবং অনুপ্রেরণার ফসলই হিন্দুধর্ম প্রচার এবং সঞ্চারিত করতে চায়।'' মন্দিরে পুরোহিত নিয়োগের ব্যাপারে তামিলনাড়ু সরকারের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আদি শৈব শিবচারীগল নল সঙ্গম-এর দায়ের করা পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী পুরোহিত নিয়োগের পক্ষেই সুপ্রিম কোর্ট রায় প্রদান করেছে। পুরোহিত নিয়োগের ব্যাপারে মন্দিরের ধর্মীয় পবিত্রতা সমর্থন করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ধর্মীয় স্বাধীনতার মধ্যে ধর্মীয় আচারও অন্তর্ভুক্ত। এমনকী এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে যে সরকার কোনো ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না মানে এই নয় যে এই বিষয়ে কোনো বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হলে আদালত তার বিচার করতে পারবে না।

পাক-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আসা শরণার্থীদের জন্য দু' হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৯৪৭ সালের পাক অধিকৃত কাশ্মীরের শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য দু' হাজার কোটি টাকা মঞ্জুর করায় শরণার্থীরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করেন। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী আরও বেশি অর্থ মঞ্জুর করবেন। কেননা সবার পুনর্বাসনের জন্য প্রায় ৯২০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে।

জম্মু-কাশ্মীর শরণার্থী অ্যাকশন কমিটির সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়ে দু' হাজার কোটি টাকার প্যাকেজকে স্বাগত জানিয়েছেন। এই সংস্থা পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া লোকেদের সমর্থনে কাজ করে। সংস্থার সহ-সভাপতি অমরিক সিংহ এই প্যাকেজের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীও প্যাকেজ ঘোষণার সময় 'এটা কেবলমাত্র শুরু' বলে জানিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, প্রায় ছয়দশক পরে দেশের কোনো সরকার উদ্বাস্তুদের জন্য এভাবে অর্থ বরাদ্দ করলেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
28 December - 2015 - Rs. 10.00

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

Wide beam angle for better light spread

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!